শিবরাম চক্রবর্তী

প্রথম ধাক্কায় চিংপটাং

শিবরাম চক্রবর্তী

প্রথম ধাক্কায় চিৎপটাং

সংকলনে

এহসান চৌধুরী

আরো প্রকাশন

আরো প্রকাশন

১২/১৩, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN 984-728-011-8

প্রকাশক ❑ আলমগীর মল্লিক
আরো প্রকাশন
১২, ১৩ / ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল ❑ ২১শে বইমেলা ২০১১

প্রচ্ছদ ❑ **মুশতাক ইবনে আয়ুব**

বর্ণ বিন্যাস ❑ আবির কম্পিউটার

মুদ্রণ ❑ হেরা প্রিন্টার্স

মূল্য ❑ একশত বিশ টাকা

ভূমিকা

যে কোন কারণেই হোক হাসির লেখা পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে লুপ্ত হতে বসেছে। শুধু আমাদের দেশে নয় বিদেশেও। এর একটা কারণ, হয়ত অতিমাত্রায় কলকারখানার প্রসার হওয়ায় জড়বাদী জগতে হাসির অবকাশ বিশেষ নেই, তাই ধীরে ধীরে হাস্যরসের অবলুপ্তি ঘটছে।

অথচ অন্য কোনো দেশের কথা থাক, এই বাংলাদেশে হাসির অভাব কখনো ঘটেনি, অন্নের অনটন ঘটেছে, মহামারীর আক্রমণে দেশ বিপর্যস্ত হয়েছে, তবু জননীরা দুষ্টু খোকাকে ঘুম পাড়ানোর সময় বর্গীদের কিভাবে খাজনা দেবেন ভেবে আকুল হয়েছেন। কারণ, সব ধান বুলবুলিতে খেয়ে গেছে। সামান্য কথা, কিন্তু গভীর অর্থে ভরা—আর তার ফলেই অসামান্য হয়ে উঠেছে।

আমরা দেখেছি সাধারণ পল্লীর মানুষ, চাষী, নিরক্ষর, মেহনতী মানুষ, সকল শ্রেণীর বাঙালির মুখে মুখে কেমন সহজ সরস কথা, ইদানিং অবশ্য সে সব বিরল হয়ে এসেছে। এখন সবাই যেন মারমুখো, রসিকতা বুঝতে না পারা এবং করতে না পারাটা একটা ব্যাধি বিশেষ।

শিবরাম চক্রবর্তী পঞ্চাশ বছর ধরে লিখছেন। লিখছেন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, সাংবাদিক মন্তব্য। অজস্র রচনা। এইসব রচনার ভিত্তি কিন্তু রঙ্গরস নয়, তার প্রমাণ তাঁর 'মস্কো বনাম পন্ডিচেরী", "যখন তারা কথা বলবে", "চাকার নীচে" এবং "মানুষ" ও "চুম্বন" নামক দুইটি কবিতার বই। একজন লেখকের সামগ্রিক বিচার তার সমগ্র রচনায়।

শিবরাম চক্রবর্তী কীভাবে এবং কেন হাসির গল্প লিখতে শুরু করলেন তা বোধহয় কোন জায়গায় বলেননি। কিন্তু সরসতা ছিল তাঁর অন্তরে তার এই আশ্চর্য রসজ্ঞান তাঁকে বাঁচিয়েছে। উদ্ধার করেছে নাগরিক জীবনের কলুষিত আবহাওয়া থেকে,ও তিনি তাই সকল প্রকার আবিলতা থেকে আপনাকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। মুক্তারামে তিনি প্রায় সারা জীবন কাটালেন মুক্ত আরামে। এবং তা সম্ভব হয়েছে একটিমাত্র হাতিয়ারের জন্য, তার নাম হাস্যরস।

তিনি সবিস্তারে একাধিকবার বলেছেন কী সূত্রে ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করেছিলেন। সে কথার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। শিবরাম চক্রবর্তী স্বয়ং শিশু। শিশু ভোলানাথ কথাটি যেন তাঁর বিশ্লেষণ, তাই তাঁর অজস্র শিশু বন্ধু। জগৎ পারাবারের তীরে যেসব শিশুরা খেলা করে কে তাদের বন্ধু? শিবরাম চক্রবর্তী। তিনি কারো কাকা, কারো মামা। অজস্র তাঁর ভাইপো ও ভাগনের দল। এদের অনেকগুলি তাঁর দেখা, অনেককে তিনি চাক্ষুষ দেখেননি। কিন্তু এদের কথা ভেবেই এদের জন্যেই তিনি লিখেছেন ছোটদের লেখা।

শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য গোয়েন্দা কাহিনী কিংবা এ্যাডভেঞ্চার বা বেদ-পুরানোর কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ না করে হাসির কথাই বলতে বসলেন।

শিবরাম চক্রবর্তী গল্প পড়া সহজ। পড়ে হাসাও হয়ত সহজ। কিন্তু সহজ কথা সহজে লেখা যায় না, এসব লেখা যেমন কঠিন, তেমনই কঠিন তার বিচার বিশ্লেষণ।

বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসিক সাহিত্যিকদের তালিকায় শিবরামের নাম যেমন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, তেমনই আবার তাঁর পরে আর কারো নাম নেই। তিনিই যেন শেষতম প্রতিনিধি।

দীর্ঘকাল তিনি আসর জমিয়ে বসে আছেন। স্বীয় মহিমায় তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি একক এবং 'অনন্য। বিদেশী সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনা করার একটা রেওয়াজ আমাদের দেশে আছে। শিবরাম চক্রবর্তী নিজস্ব ভঙ্গীর জন্যই অনন্যসাধারণ। তাঁর সঙ্গে কারো মিল নেই।

পরিহাসরসিক ও ব্যঙ্গরচনায় একজন সুদক্ষ শিল্পী হিসাবে শিবরাম চক্রবর্তী পরিচিত হলেও তাঁর সাহিত্য রচনার অন্য বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কুশলী ডুবুরির মত শিবরাম চক্রবর্তী ডুব দিয়েছেন জীবনের গভীরে আর তারপর উঠে এসেছেন মণিমুক্তায় দুটি হাত পূর্ণ করে।

যে জীবন চল-চঞ্চল, গতি-উচ্ছল, আনন্দ বেদনা, হাসি ও অশ্রুতে ছল ছল সেই মায়ারস অভিষিক্ত সারসতাই শিবরামের প্রধান হাতিয়ার। এই গ্রন্থে ঠিক তেমনটিই দেখা যায়।

গ্রন্থটি তোমাদের কাছে আদরণীয় হবে বলে আমার বিশ্বাস।

শেকড়
জানুয়ারি, ২০১১
রোড নং-২
প্রান্তিকা আ/এ
নিরালা, খুলনা-৯১০০

ভবদীয়
সংকলক

সূচিপত্র

প্রথম ধাক্কা : হর্ষবর্ধনের বাস-লীলা

দ্বিতীয় ধাক্কা : গোবর্ধনের গৃহারোহণ

তৃতীয় ধাক্কা : গৃহপ্রবেশ ও শেষরক্ষা

চতুর্থ ধাক্কা : বাইশকোপে—মানে, বাইশজনের কোপে শ্রীহর্ষবর্ধন!

পঞ্চম ধাক্কা : ইঁদুর-চরিতামৃত

ষষ্ঠ ধাক্কা : অথ শ্রীভিক্ষুক দর্শন

সপ্তম ধাক্কা : বে-দন্তবাগীশের বিবরে

অষ্টম ধাক্কা : কেশ-কর্ষণের করুণ কাহিনী

নবম ধাক্কা : আনন্দবাজারের আনন্দ-সংবাদ

দশম ধাক্কা : হর্ষবর্ধনের সমুদ্র-লঙ্ঘন

এহসান চৌধুরী

কথা-সাহিত্য
জন্ম : ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০
জন্মস্থান : যশোর
শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম.এ

লেখকের কিশোর গল্পগ্রন্থ

কাঠিমামার এ্যাডভেঞ্চার (৩য় সং), কাঠিমামার নতুন খবর (২য় সং), কাঠিমামার শিকার কাহিনী (২য় সং), কাঠিমামার ব্যাপার-স্যাপার (২য় সং), ফরাসি রূপকথা (২য় সং), চীনা লোক-কাহিনী (২য় সং), পশু-পাখিদের গল্প (২য় সং), শ্রেষ্ঠ শিকারের গল্পকাঠিমামার ভৌতিক গল্প (২য় সং), সাবধান কাঠিমামা (২য় সং), বাঘ-সিংহের গল্প (২য় সং) চিড়িয়াখানার জীবজন্তু, বেরিং সাগরের খুনি তিমি, ফিরে এলেন কাঠিমামা, সোনালী দিনের গল্প, চার ইয়ারের হাসির গল্প, ঈশপ সাহেবের শেয়াল, ছাদের উপর উট, জীবজন্তুর অ্যালবাম, ভয়ঙ্কর সব ডাইনোসর, সমুদ্রের ভয়ঙ্কর প্রাণী, তলস্তয়ের নীতিগল্প, রাশিয়ান লোকগল্প, পাগলা হাতির পাগলামি, মহাস্থানগড়ের আতঙ্ক, অপারেশন খেমকারান, প্যাঁচালপুরের বাঘ, ভেজাল বনমানুষ। কাঠিমামার জয়যাত্রা ।.....

প্রথম ধাক্কা
হর্ষবর্ধনের বাস-লীলা

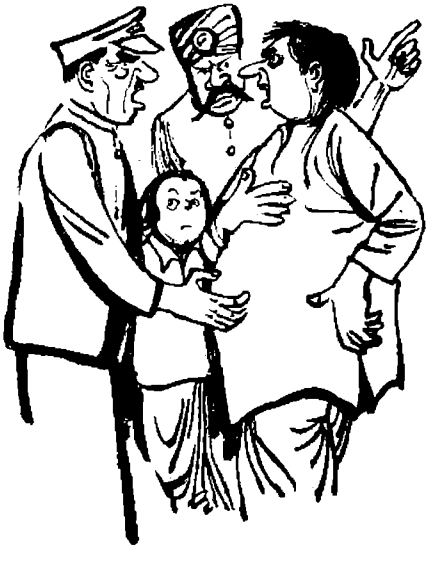

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধনবাবু দুই ভাই, কাঠের কারবারে বড় মানুষ। কর্ম-সূত্রে আসামের জঙ্গলেই চিরটা কাল কাটিয়ে এসেছেন; এবার ওঁদের শখ হল কলকাতা শহরটা দেখবার। টাকা তো কামানো কম হয়নি, এবার কিছু কমানো দরকার। তা ছাড়া, তাঁরা কিছু ফেরারি আসামী নন যে সারা জন্মটা আসামেই কাটাতে হবে।

কলকাতা শহরটা চোখে না দেখলেও কানে যে শোনেননি তা নয়। অনেক কিছুই শুনেছেন—অনেক দিন থেকে এবং অনেক দিক থেকে। মোটরগাড়ির কথা শুনেছেন, বড় বড় বাড়ির কথা শুনেছেন, বায়োস্কোপের কথা শুনেছেন, এমন কি ছবিতে আজ-কাল কথা কইছে এমন কথাও ওঁদের কানে এসেছে।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে কলকাতার লোকেরা নাকি তেমনি মিশুক নয়—পাশের বাড়ির খবর রাখে না, পাড়ার লোককে চিনতে পারে না। রাস্তায় বেরুলে খালি মানুষ আর মানুষ—কিন্তু আশ্চর্য এই, কেউ কারু সঙ্গে কথা কয় না, উপরন্তু গায়ে পড়ে ভাব জমাতে গেলে বিরক্ত হয়। এমনকি অচেনা কেউ যদি তোমার গায়ে এসে পড়ে, পরমুহূর্তেই দেখবে তোমার পকেট বেশ হাল্‌কা হয়ে গেছে। আলাপ না করলেও বিলাপ—কোনদিকেই রক্ষা নেই।

বাস্তবিক, তাঁদের কলকাতা ব্রাঞ্চের কর্মচারী দীর্ঘছন্দে চিঠি লিখে শহরের যা হালচাল জানিয়েছে তাতে ভয়ের কথাই বইকি। সবচেয়ে ভাবনার কথা ভাব না করার কথায়—তাঁরা দুই ভাই-ই ভাব করতে ওস্তাদ—চেনা, অচেনা, অর্ধ-চেনার সঙ্গে আড্ডা জমাতে তাঁদের জোড়া নেই—সকালে, বিকেলে, দুপুরে এবং অনেক সময়ে গভীর রাত্রে অনর্গল কথা না বললে তাঁদের ভাত হজম হয় না। গল্প করতে তাঁদের এমন ভাল লাগে—সেজন্যে কাজ পণ্ড করতেও তাঁদের দ্বিধা নেই। কথা বলবার জন্যে আহার-নিদ্রা ভুলতে প্রস্তুত, অপরকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে প্রস্তুত, এমনকি তার সঙ্গে ঝগড়া করতে পর্যন্ত পরোয়া নেইকো। কিন্তু কলকাতার লোকরা মিশুক নয় এ খবরে তাঁরা ভারি দমে গেছেন।

কিন্তু দুই ভাই মরীয়া হয়ে উঠেছেন—শহরটা একবার ঘুরে আসবেনই, যা থাকে কপালে!

বড় ভাই বলেছেন—'যদি কলকাতাই না দেখলাম, তবে ভবে এসে করলাম কী? কেবল কাঠ—কাঠ—আর কাঠ , কাঠ কি সঙ্গে যাবে?'

কাঠের প্রতি নেহাৎ অবিচার হচ্ছে দেখে ছোট ভাই মৃদু আপত্তি তুলেছিল—'না দাদা, কাঠ সঙ্গে ঠিক না গেলেও অন্তিমে কাজে লাগে।'

বড় ভাই প্রবলভাবে ঘাড় নেড়েছেন—'আমি না হয় কবরেই যাব, তবু কলকাতাকে একবার দেখে নেব—না দেখে ছাড়ছি না।'

এর পর আর কথা চলে না, কিংবা কথা চললেও কথা বাড়ানোর চেয়ে কলকাতা বেড়ানোর ইচ্ছা ছোট ভাইয়ের মনে তীব্রতর ছিল বলে এ ক্ষেত্রে সে

চেপে যায়। অতএব একদা অতি প্রত্যুষে গৌহাটির বিখ্যাত বর্ধন অ্যান্ড বর্ধন কোম্পানির দুই বড় কর্তাকে শিয়ালদা স্টেশনে এসে অবতীর্ণ হতে দেখা গেল।

গোটা প্ল্যাটফর্মটা এধার থেকে ওধার দু'-দুবার টহল দিলেন, কিন্তু নাঃ, কর্মচারীটার দেখা নেই। কাল দু-দুটো জরুরি তার করে জানানো হয়েছে তাঁরা যাচ্ছে তবু হতভাগ্যা—

গোবর্ধন বলল—'এমন তো হতে পারে সারা রাত জেগে বেচারাকে হিসেব মেলাতে হয়েছে, ভোরবেলার দিকটায় তা একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা যে নিতান্তই এসে পড়ব এজন্যে হয়ত সে একেবারে প্রস্তুত ছিল না—'

হর্ষবর্ধন বললেন—'উঁহু।'

গোবর্ধন ভ্রু কুঁচকে, যেন গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিচ্ছে এইভাবে সবচেয়ে শোকাবহ দুর্ঘটনার ইঙ্গিত করল—'কিংবা এমনও হতে পারে যে ব্যাটা কিছুতেই তহবিল না মেলাতে পেরে অবশেষে বাকি যা ছিল মেরে নিয়ে আমরা যখন শিয়ালদায় নামছি তখন সে হাওড়া দিয়ে সট্‌কে পড়ছে?'

হর্ষবর্ধন তথাপি নির্লিপ্তভাবে জবাব দেন—'উঁহুহু।'

বড় বড় গবেষণা এইভবে পুনঃপুনঃ ব্যর্থ হওয়ায় মনে মনে চটে গিয়ে গোবর্ধন বললে, 'তবে তুমি কী ভাবছ শুনি?'

'হর্ষবর্ধন ভাইয়ের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করেন—'কিছু না, কলকাতার হালচালই এই। লোকটা নেহাৎ মিথ্যা কথা লেখেনি!'

গোবর্ধন বলে—'স্বীকার করি লোকটা কলকাতার, কিন্তু তাই বলে নিজের মনিবের সঙ্গে মিশবে না—এমন কখনও হতে পারে?'

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের বোকামি দেখে অবাক হন—'কেন, স্পষ্টই তো লোকটাকে না মিশতে দেখা যাচ্ছে। তাকে দেখাই যাচ্ছে না। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে লোকটার কথা সত্যি। এ তো হাতে-নাতেই প্রমাণ। চল্, বেরিয়ে একটা মোটর ভাড়া করিগে।'

দাদার 'লজিকে'র বহর দেখে ভাইও কম অবাক হয় না, কিন্তু নির্বাক হবার কথা তার না হলেও, কথা-কাটাকাটিতে না কাটিয়ে সময়টা মোটরে কাটালেই কাজ দেবে ভেবে আপাতত সে নিজেকে দমন করে ফেলে।

হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসা করেন, 'চিঠিখানা তোর কাছে আছে তো? বাড়ির ঠিকানা ছিল তাতে।'

গোবর্ধন ঘাড় নেড়ে জানায়—'চিঠি নেই, তবে মনে হচ্ছে ১৩/১২ রসা রোড, ভবানীপুর।'

হর্ষবর্ধন অত্যন্ত ভাবিত হন—'কেমন বাড়ি ভাড়া করেছে কে জানে! লোকটা নিজে তো মিশুক নয়ই, হয়ত এমন পাড়ায় বাড়ি দেখেছে যেখানে কথা কইতে গেলে লোকে বিগড়ে যায়। কিছু জিজ্ঞেস করলে তেড়ে মারতে আসে।'

গোবর্ধন সায় দেয়—'কিংবা মেশবার ভয়ে তাও আসে না।'

'সেইটাই তো আরো ভাবনার কথা—' কিন্তু হর্ষবর্ধনের ভাবনায় বাধা পড়ে, একজন ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে—'ট্যাক্সি চাই বাবু, ট্যাক্সি?'

'যদি মোটরেই চাপি তাহলে তোমার ওই পুঁচকে গাড়িতে যাব কেন হে? গোবরা, ওই যে ভারি গাড়িখানা বেজায় ধূমধাড়াক্কা করে আসছে ওটাকে দাঁড় করা।' হর্ষবর্ধন এক বৃহদাকার ডবল ডেকারের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেন, 'বড় গাড়িতে বেশি ভাড়া লাগবে, এই তো? কলকাতায় ফূর্তি করতে আসা, টাকার মায়া করলে চলবে কেন?'

শীতের প্রত্যুষে জনবিরল পথে যাত্রীহীন বাসখানা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছুটছিল, গোবর্ধনের সঙ্কেতমাত্র খাড়া হোল। হর্ষবর্ধন উঠেই হুকুম দিলেন—'চালাও তোমার তেরোর বারো রসা রোড। কোথায় জানা আছে তো?'

কন্ডাক্টর জবাব দেয়— 'আমাদের তিন নম্বর বাস ওইদিকেই তো যায়।'

মনিব্যাগ থেকে একখানা একশ টাকার নেট বার করে হর্ষবর্ধন তার হাতে দেন। কন্ডাকট্‌র জানায়—'কিন্তু এর চেঞ্জ তো নেই!'

হর্ষবর্ধন বলেন—'দরকার নেই চেঞ্জ দেবার; পুরোটাই ওর ভাড়া ধরে নাও। চিরকাল মোটর-গাড়ির গল্প শুনে আসছি, আজ সুযোগ হয়েছে, শখ মিটিয়ে চাপব। যত টাকাই লাগুক, কেয়ার করি না আমরা।'

এতক্ষণে গোবর্ধন কথা বলবার ফুরসৎ পায়—'দিব্যি গাড়ি দাদা। দেখছ কতগুলো সীট, তার ওপরে গদিমোড়া! আবার হাওয়া খেলবার জন্যে এতগুলো জানলা! একটা বড়ো আয়নাও রয়েছে সামনে! এমনি একটা মোটর দেশে নিয়ে যাব, কী বল দাদা? মোটরগাড়ি আর মোটর-বাড়ি একসঙ্গে!'

'আলবৎ! দেশে নিয়ে যেতে হবে বইকি! যদি চেনা লোকের চোখেই না পড়লাম তবে মোটরে চেপে লাভ কী হোলো?'

'এখন যে-কদিন কলকাতায় আছি গাড়িখানায় চাপা যাবে, কী বল দাদা?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়—সে কথা বলতে? সাত দিনের জন্যে এটাকে ভাড়া করে ফেলছি এক্ষুণি।'

হঠাৎ বাস দাঁড়াল এবং একটি তরুণী ভদ্রমহিলা উঠলেন। হর্ষবর্ধন একবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপর ফিস্‌ফিস্ করে গোবর্ধনকে বললেন—'উঠেছে উঠুক, কিছু বলিস নে। মেয়েটা যদি খানিকটা মোটরের হাওয়া খেতে চায় ঘুরে—খাক না, ক্ষতি কি; জায়গা যথেষ্টই আছে।'

তরুণীটি একটি সিকি বের করে কন্ডাক্টরের হাতে দিতে গেল। হর্ষবর্ধন বাধা দিলেন—'পয়সা কিসের?'

'খিদিরপুরের ভাড়া।'

'আপনার সিকি আপনি নিজের কাছে রেখে দিন, ওটি আমরা হ'তে দিচ্ছি না! আপনি আমাদের গাড়িতে উঠেছেন, আমাদের সৌভাগ্য, সেজন্যে কোন পয়সা নিতে আমরা অক্ষম।' ব'লে হর্ষবর্ধন গম্ভীরভাবে গোঁফে একবার চাড়া দিয়ে নিলেন।

মেয়েটির বিস্ময় কমতে না কমতেই আবার বাস দাঁড়াল এবং একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি উঠলেন। যেমনি না তিনি মনিব্যাগের মুখ খুলেছেন অমনি গোবর্ধন গিয়ে করজোড়ে নিবেদন করল—'মাপ করবেন, পয়সা নিতে পারব না।

আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে বসুন, আরাম করে হাওয়া খান—কিন্তু তার জন্যে ভাড়া দিতে দেব না আপনাকে। মনে করুন এটা আপনার নিজের গাড়ি।'

গোবর্ধনের নিজের গোঁফ ছিল না, চাড়া দেবার জন্যে দাদার গোঁফ ধার নেবে কি না ভাবল একবার।

দু' মিনিটের মধ্যে আরো গোটা তিন ভদ্রলোক, দুটি অত্যন্ত মোটা সোটা মেয়েছেলে এবং আধ ডজন ফচ্‌কে চ্যাংড়া গাড়িতে প্রবেশ করল। এবার হর্ষবর্ধনের কপালে রেখা দেখা দিল এবং গোবর্ধনের ভ্রূ কুঞ্চিত হল; বড় ভাইকে চাপা গলায় প্রশ্ন করলো—'কে বলছিল গো কলকাতার লোকরা মিশুক নয়?'

কিছুক্ষণেই বাস বোঝাই হয়ে গেল, হর্ষবর্ধন প্রত্যেক অভ্যাগতকেই সাদরে অভ্যর্থনা করছিলেন এবং তাদের ভাড়া দিতে নিরস্ত করতেও তাঁর কম বেগ পেতে হচ্ছিল না। লোকগুলোর অপব্যয়-প্রবৃত্তি দেখে গোবর্ধন আর বিস্ময় দমন করতে না পেরে দাদাকে নিজের অভিমত জানাল—'কলকাতার লোকগুলো ভারি খর্‌চে কিন্তু দাদা!'

'চলে আসুন। জায়গা যথেষ্টই রয়েছে। আরামে হাওয়া খান। একটি পয়সাও দিতে হবে না। আমাদের সৌভাগ্য যে আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের গাড়িতে আসছেন।' হর্ষবর্ধন থামবার ফুরসৎ পান না।

আরও প্যাসেঞ্জার উঠতে লাগল, বাসের দু'ধারের সীট ভর্তি হয়ে গেল, এমনকি মাঝামাঝি দু'থাক লোক গাদাগাদি দাঁড়িয়ে গেল,—দরজা, ফুটবোর্ড পর্যন্ত ভর্তি হবার দাখিল। অবশেষে একজন চীনাম্যান ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়তেই গোবর্ধন সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছে—'দাদা, দাদা, দেখ দেখ, এক চীনাম্যান!'

দাদা অদৃষ্টপূর্ব এবং ইতিহাস-বিশ্রুত হুয়েন-সাং ফা-হিয়েনের বংশ-ধরটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে গুরুগম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন 'হুঁ, ওদের দাড়ি হয় না বটে!'

গোবর্ধন যোগ করে—'হ্যাঁ দাদা! কামাবার হাঙ্গামা নেই—ওরাই এ জগতে সুখী!'

এমন সময়ে কন্ডাক্টর জানাল যে রসা রোড এসে পড়েছে। দুই ভাই ব্যস্ত হয়ে ঠেলে-ঠুলে কোন রকমে নেমে পড়লেন, নামবার আগে ঘোষণা করলেন—'ওহে, যতক্ষণ এঁরা চাপতে চান চাপুন, যেখানে এঁরা যেতে চান নিয়ে যাও এঁদের। আরও যা টাকা লাগে আমাদের ঠিকানায় এসে নিয়ে

যেয়ো—তেরোর বারো রসা রোড, বুঝলে? আর আপনারা, বন্ধুগণ, বিদায়! আরামে ঘুরুন সারা দিন, যত খুশি, যতক্ষণ খুশি! কারুর একটি পাই পয়সা লাগবে না।'

বাস থেকে নেমেই গোবর্ধন প্রশ্ন করল—'কলকাতার হালচাল কী রকম বুঝলে দাদা?'

—'হ্যাঃ ! কে বলে কলকাতার লোকরা মিশুক নয়? একেবারে মিথ্যা কথা, বাজে কথা, ভুয়ো কথা! মেশামেশির ধাক্কায় আমার দম আটকে যাবার জোগাড় হয়েছিল! শেষকালে একটা চীনাম্যান পর্যন্ত—! আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়ত সাহেব-সুবোরাও এসে উঠত! এমনকি মেমরাও। বাপ রে বাপ! এ রকম গায়ে পড়া মিশুক লোক আমি দুনিয়ায় দেখিনি! কিন্তু একটা সর্বনাশ হয়েছে—

'গোবর্ধন ব্যস্ত হয়ে ওঠে—'কী? কী? পকেট মেরেছে নাকি?'

'উঁহু! আমাদের ঠিকানাটা দিয়ে ফেলেছি ওদের। ভারি মুস্কিল করেছি! খপ্ করে বাড়ি ঢুকেই খিল এঁটে দিতে হবে, আর যদি সম্ভব হয় বাড়ির চারধারে কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে দেওয়া ভাল। তাতে অনেকটা নিরাপদ। কলকাতার লোক যে-রকম মিশুক দেখছি, বাড়ি চড়াও হয়ে আমাদের সঙ্গে খেতে-শুতে না চেয়ে বসে, কী জানি!'

দ্বিতীয় ধাক্কা
গোবর্ধনের গৃহারোহণ

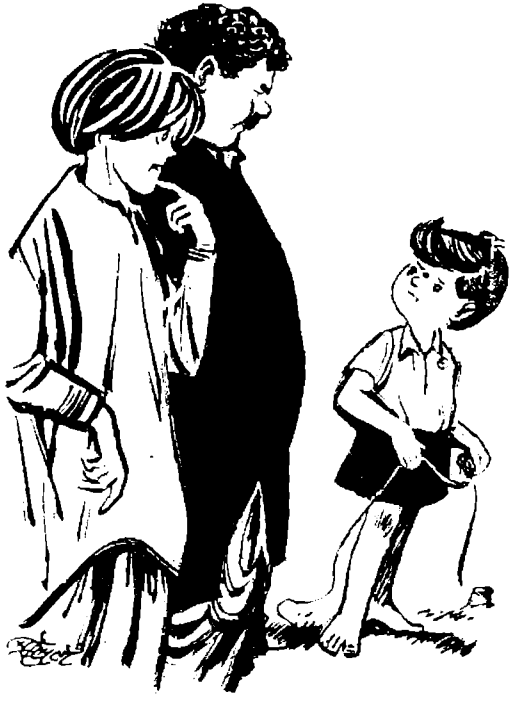

চওড়া ফুটপাথে উঠেই হর্ষবর্ধন প্রশ্ন করেন—'কাকে জিজ্ঞাসা করি?'

এইমাত্র তিনি গোবর্ধনকে যে দারুণ দুর্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন, তার চেয়েও গুরুতর ভাবনা তাঁর কাঁধে ভর করে—কলকাতার মত শহরে এত

ঘর-বাড়ির মধ্যে নিজের 'থাক্‌তব্য' জায়গার খোঁজ করা কী কষ্টসাধ্য—কী—ভীষণ ঝকমারি! এই সমস্ত নিদারুণ মিশুক লোকদের মাঝখানে শেষে কি ফুটপাথেই দিনরাত কাটাতে হবে?

গোবর্ধন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়।

'বাড়ির ঠিকানা বাগানোর কী হবে রে?' হর্ষবর্ধনের প্রশ্ন হয়।

গোবর্ধন জবাব দেয়—'কেন, বাড়ির ঠিকানা তো পাওয়াই গেছে, এখন ঠিকানার বাড়ি বল!'

'ওই-একই কথা, একই কথা হোলো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কাকে?'

গোবর্ধন যোগ দেয়—'নিরাপদও তো নয় জিজ্ঞসা করা! যদি এখন খুড়ো, জ্যাঠা,মাসি, পিসি, মামা, মাস-শাশুড়ি সব নিয়ে এসে হাজির হয় আমাদের বাড়ি? যে রকম সব মিশুক দাদা!'

'হুঁ!' হর্ষবর্ধন মাথা চালেন—'বাড়িতে ভারি গোলমাল হবে তাহলে।'

গোবর্ধন আরো বেশি মাথা নাড়ে—'নিজেরা সমস্ত ভাড়াটা গুণে শেষে চৌকির তলাতেও শোবার ঠাঁই পাব কি না সন্দেহ!'

—'তবে?' হর্ষবর্ধন মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

—গোবর্ধন দাদার দিকে তাকায়—'ফুটপাথে লাট্টু ঘোরাচ্ছে, ওই ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করব?'

—'নিরাপদ তো?'

—'না-হয় যত-রাজ্যের ছেলে—ওর বন্ধুদের সব জুটিয়ে আনবে, এই তো? তা আনুক গে। ছেলেরা বাড়ির মধ্যে থাকতে খুব কমই ভালবাসে। একবার বাইরে ছাড়া পেলে হয়—তারপর গড়ের মাঠ বলে কি একটা দেদার ফাঁকা জায়গা আছে না কলকাতায়? তুমিই তো বলছিলে গো?'

'সনাতন খুড়োর কাছে শুনেছিলাম বটে। কিন্তু কোন্‌দিকে জানি নে তো।'

'সেটা জেনে নিয়ে একটা কোন খেলার ছুতো করে ছেলেদের সব ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে গড়ের মাঠের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে এলেই হবে।'

হর্ষবর্ধন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আদেশ দেন—'তবে ওকেই বল্ তাহলে।'

দু'জনে লাট্টু-নিরত খোকার দিকে অগ্রসর হন—গোবর্ধনই সাহস সঞ্চয় করে'ওহে খোকা, শোন তো এদিকে!'

খোকার দিক থেকে তীক্ষ্ণ জবাব আসে—'খোকা বললে আমি সাড়া দিই না!' না তাকিয়েই সে জবাব দেয়।

গোবর্ধন ভড়কে যায়, কিন্তু দাদা পাশে থাকতে ভয়ের কী আছে, এই ভেবে মরীয়া হয়ে ওঠে, তার কম্পিত কণ্ঠ শোনা যায়—'তবে কী বললে তুমি সাড়া দাও শুনি?'

'খোকা বললে আমি সাড়া দিই না। দেব কেন? আমি কি খোকা? খোকা তো যারা দুধ খায়।' ছেলেটির স্পষ্ট, অভিমত প্রকাশ পায়।

ব্যাপার সহজ নয় বিবেচনা করে এবার হর্ষবর্ধন নিজেই আগুয়ান হন—এহ্ বালক! খোকা বলা তোমাকে খারাপ হয়েছে আমরা মেনে নিচ্ছি, এখন বল তো এখানে এত সব বাড়ির ভেতর তেরোর বারো কোন্‌টি?'

হর্ষবর্ধনের গুরু-গম্ভীর আওয়াজে বালকের 'লাট্টুশীলতা' তৎক্ষণাৎ থেমে যায়—'কী বললেন, তেরোর বারো?'

'হ্যাঁ, তেরোর বারো কিংবা ত্রয়োদশের দ্বাদশ—যেটা তোমার বুঝবার পক্ষে সুবিধে।'

ছেলেটি আর বিস্ময় দমন করতে পারে না—'কী করে জানলেন? আমিই তো! আমারই বয়স তেরো, ইস্কুলে বারো লিখিয়েছে!'

এমন সময়ে পাশ দিয়ে একটা পরিচিত সাইকেল যেতে দেখে ছেলেটি হর্ষবর্ধনের প্রত্যুত্তরে প্রতীক্ষা না করেই মুহূর্ত মধ্যে তার পেছনের ক্যারিয়ারে চেপে বসে এবং পরমুহূর্তেই বালক ও সাইকের চালক দুজনেরই টিকি এত দূরে দেখা যায় যে উচ্চৈঃস্বরে জবাব দেবার কোন সঙ্গত কারণ হর্ষবর্ধন খুঁজে পান না।

'গোবরা, বুঝলি কিছু?'

—'উঁহু!'

—'তোর ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই দেখছি!'

গোবর্ধন এবার চটে—'বুঝব না কেন? অনেক আগেই বুঝেছি, বুঝবার এতে এমন কী আছে? কলকাতার সাইকেলের পেছনগুলো সব ছেলেদের জন্যে রিজার্ভ করা, এই তো? যে-কোন ছেলে যখন খুশি চাপলেই হল।'

হর্ষবর্ধন বলেন—'তা হতে পারে। কিন্তু ছেলেটারও নম্বর তেরোর বারো—তা কিছু বুঝেছিস? যেমন ঘর-বাড়ির, তেমনি কলকাতার প্রত্যেক ছেলেরই একটা করে নম্বর আছে—মার্কামারা ছেলে সব!'

—বলে হর্ষবর্ধন গোঁফে চাড়া দেন। অনন্যোপায় গোবর্ধন দাদার সঙ্গে সমান পাল্লা দেবার প্রয়াসে একবার দাড়ি চুলকে নেয়—'থাকবেই তো নম্বর। কেন, কলকাতায় ছেলের কি কিছু কম্‌তি? এই যত লোক দেখছ তাদের

প্রত্যেকের গড়-পড়তা চারটে-পাঁচটা করে ছেলে—আবার কারু-কারু চৌদ্দ পনেরটাও আছে। এত লাখ-লাখ ছেলের মধ্যে পাছে হারিয়ে যায় কি গুলিয়ে যায়—বাপ মা-রা না খুঁজে পায় সেইজন্যেই এই নম্বর দেওয়া! এ আর আমি বুঝিনি? তোমার ঢের আগেই বুঝেছি।'

'আমার আগেই বুঝেছিস?' হর্ষবর্ধনের গোঁফ হস্তচ্যুত হয়—'বটে? তাহলে তুই আমার আগেই জন্মেছিস্, তাই বল্? আরে মুখ্যু,আগে না জন্মালে কখনো আগে বোঝা যায়? তা'হলে আমার এই ইয়া গোঁফ—তোর কোনো গোঁফ নেই কেন?'

এমন জাজ্বল্যমান উদাহরণের বিপক্ষে গোবর্ধনের বাক্‌বিতন্ডা অগ্রসর হবার পথ পায় না। কিন্তু হর্ষবর্ধন কি থামবার! 'বড় শক্ত জায়গায় এসে পড়েছিস গোবরা, বুদ্ধি একদম না খেলাতে পারলে কোনদিন তুই মারা পড়বি এখানে। চাই কি, তোমাকে নম্বর দেগে দিতে পারে—এখনো তুই ছেলেমানুষ তো! কিন্তু আমার আর সে ভয় নেই।'

হর্ষবর্ধন পুনরায় গোঁফে হস্তক্ষেপ করেন। গোবর্ধন প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করে—'ম্যানেজারের চিঠিটার মানে বুঝেছ? বালক লিখতে ভুলে লোক লিখে ফেলেছে। কলকাতার বালকরাই মিশুক নয়। দেখলেই তো—সাইকেলে চেপে সটান চোখের ওপর সটকান দিল!'

হর্ষবর্ধন বলেন—'তোরও যেমন বুদ্ধি তারও তেমনি! আমরা কি এত পয়সা খরচ করে বালকদের সঙ্গে মিশবার জন্যেই কলকাতায় এসেছি নাকি? এ রকম ভয় দেখাবার মানে? ব্যাটাকে দেখতে পেলেই ডিসমিস করব! আমরা প্রবীণ, প্রাজ্ঞ, প্রাপ্তবয়স্ক লোক—বালকদের সঙ্গে মিশতে যাবই বা কেন? দূর দূর!'

হঠাৎ গোবর্ধন দাদার পিলে চমকে দেয়—'ঐ যে দাদা! আমাদের পাশেই যে তেরোর বারো!'

—হর্ষবর্ধন পাশ ফিরে দেখেন, সত্যিই তো, তোরোর বারোই তো বটে! বাঁ-হাতি সম্মুখ বাড়িটার গায়ে পরিষ্কার করে নম্বর দাগা—১৩/১২, বারোটাকে স্পষ্ট করবার জন্যেই মাঝে দাঁড়ি দিয়ে দু'ভাগ করে দিয়েছে তাতে হর্ষবর্ধনের সন্দেহ থাকে না। হঠাৎ তাঁর মনে এত পুলকের সঞ্চার হয় যে তিনি ভাইয়ের সমস্ত বোকামি মার্জনা করে দেন। বুদ্ধিহীনতা যতই থাক, দৃষ্টিক্ষীণতা নেই গোবরার।

'ও বাবা! এ যে প্রকাণ্ড বাড়ি! দু'জনে এতগুলো ঘরে শোবই বা কী করে?'

—'আজ এ-ঘরে, কাল ও-ঘরে এই করলেই হবে।' গোবরা যেন সমস্যার সমাধান করে—'সব ঘরগুলোই চাখতে হবে তো একে-একে। তুমি একটায় শুয়ো, আমি একটায় শোব।'

'উঁহু!' হর্ষবর্ধন প্রবল প্রতিবাদ করেন—'সেটি হচ্ছে না, আমার ভূতের ভয় করবে তাহলে। তোমাকে আমার কাছে-কাছে থাকতে হবে। এত বড় বাড়িতে রাত্রে একলা থাকা আমার কম্ম না!'

দুঃসাহসী গোবর্ধন দাদার দুর্বলতার সুযোগে একটু মৃদু হাস্য করে নেয়। 'বেশ, তোমার কাছেই থাকব আমি। কিন্তু তুমি আমায় যখন-তখন বোকা বলতে পারবে না—তা বলে দিচ্ছি।'

'দূর, তুই বোকা হতে যাবি কেন? আমার ভাই কখনো বোকা হয়!' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের পিঠ চাপড়ে দেন—'ছেলেটা যেমন খোকা নয়, তুই তেমনই বোকা নয়।'

দাদার বিরাট পৃষ্ঠপোষকতায় পড়তে পড়তে টাল সামলে নেয় গোবর্ধন—'হ্যাঁ, মনে থাকে যেন। ফের আমাকে বলেছ কি আমি অন্য ঘরে গিয়ে শুয়েছি। কি ছাতেই শুয়ে থাকব গিয়ে, দেখো!'

হর্ষবর্ধনের কণ্ঠ করুণ হয়—'বিদেশে বিভুঁয়ে এসে অমন করিসনে গোবরা। ভূতের তাড়ায় কোনদিন হয়ত জানলা টপ্‌কে রাস্তাতেই লাফিয়ে পড়তে হবে আমায়! বিদেশে এসে বেঘোরে প্রাণটা যাবে তাহলে! আচ্ছা, এই কথা রইল, তুই যদি একগুণ বোকা হোস আমি একশো গুণ বোকা। তাহলে হবে তো?'

'না, তুমি তা'হলে হাজার গুণ।' গোবরা গম্ভীরভাবে বলে।

'বেশ, তাই।'হর্ষবর্ধনের মুখ ম্লান হয়ে আসে।

দাদার ম্রিয়মানতায় গোবর্ধনের দুঃখ পায়—'আমি হলে তবে তো তুমি হবে। আমি একগুণও না, তুমি হাজার গুণও না।'

মিনিটের মধ্যে মিটমাট হয়ে যায় দুই ভাইয়ের।

অতঃপর দুই ভাই দরজার সম্মুখে সমাগত হন। দরজায় প্রকাণ্ড ভারি তালা লাগানো। এত কষ্ট করে কলকাতায় এসে গৃহদ্বারে যে এভাবে অভ্যর্থনা লাভ করবেন হর্ষবর্ধন এ রকম আশঙ্কা কোনদিন করেননি। ঘরে না ঢুকতে দোর গোড়াতেই এই তালা—এ কী! তিনি ভারী মুষড়ে পড়েন।

গোবরা বলে—'ভেঙে ফেলব? কী বল দাদা? যখন ভাড়া দেব তখন তো আমাদেরই বাড়ি এখন!'

হর্ষবর্ধন বলেন—'ভেঙে ফেলবি, চৌকিদার কিছু বলবে না তো?'

গোবরা জবাব দেয়—'কলকাতায় আবার চৌকিদার আছে নাকি?' তবু একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে নেয়; 'তিনতালা বাড়ির যদি ভাড়া গুণতে পারি তাহলে সামান্য এক তালা ভাঙার দাম দিতে পারি না নাকি?'

'তবে ভেঙেই ফ্যাল্!' হর্ষবর্ধন হুকুম দিয়ে দেন।

গোবর্ধন প্রবল পরাক্রমে তালার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে, কিন্তু অল্পক্ষণেই তার বোধগম্য হয়, অসামান্য তালাকে সামান্য জ্ঞান করা তার অন্যায় হয়েছে মোটা তালাটা যে-দুটি কড়াকে করায়ত্ত করে রয়েছে সে-দুষ্টি অতি ক্ষীণকায়, অগত্যা গোবর্ধন তালাকে তালাক দিয়ে কড়া ধরেই কাড়াকড়ি শুরু করে দেয়। কিন্তু কেউ ছাড়বার পাত্র নয়। গোবর্ধন ঘেমে, নেয়ে, হাঁপিয়ে বসে পড়ে।

হর্ষবর্ধন এবার দরজার ওপর নিজেই পদাঘাত আরম্ভ করেন। দরজা প্রবল প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু এক ইঞ্চি পিছু হটে না—হটবার কোন মতলবই দেখায় না। কাঠের কী কঠোর দুর্ব্যবহার!

তাঁর বিরক্ত কণ্ঠ থেকে বহির্গত হয়—'দূর ছাই! এ কি ভাঙবার দরজা! কলকাতায় ভালো কাঠ রপ্তানি করার ফল দ্যাখ্ গোবরা, আমাদের কাঠ আমাদের সঙ্গেই শত্রুতা করছে! ছ্যা ছ্যা!'

গোবরা গুম হয়ে থাকে।

হর্ষবর্ধন বলতে থাকেন—'এবার থেকে কাঠ পচিয়ে ঘুন ধরিয়ে পাঠাব তেমনি। আমাদের ম্যানেজার কি আর সাধে বার-বার করে লিখে পাঠায় যে কলকাতায় ভালো কাঠ পাঠাবেন না, পাঠাবেন না, এখানে ভালো কাঠ চালিয়ে তেমন লাভ নেই; খেলো কাঠ পাঠালে ভালো হয়! এখন তার মানে বুঝছি! হুঁ, হাড়ে-হাড়ে বুঝছি!' দরজার পরাকাষ্ঠার সামনে তিনি পদচারণা শুরু করেন।—'প্রতি পদক্ষেপে টের পেয়েছি।'

গোবর্ধনের প্রাণে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়—'আচ্ছা দাদা, বাড়ির গা দিয়ে একটা লোহার পাইপ দেখলাম না—সটান গিয়ে ছাদে উঠেছে?'

'হ্যাঁ দেখলাম তো।'

'আমি ওই ধরে ছাদে উঠি গিয়ে, তারপর নেমে এসে ভেতর থেকে একটা জানলা খুলে দেব, তুমি তখন ঢুকো, কেমন?'

'পারবি উঠতে?'

'তালগাছে ওঠা আমার অভ্যাস, নারকোল গাছেও উঠেছি। খেজুর গাছেই কেবল উঠিনি কখনো।' সে কয় ঃ 'খেজুর কাউকে গায় পড়তে দেয় না তো! গায়ে যা কাঁটা!'

তখন দুই ভাই বাড়ির পাশে এসে দাঁড়ান। হর্ষবর্ধন পাইপের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করেন—'হ্যাঁ ছাদ পর্যন্তই গেছে বটে। কিন্তু পাইপ বেয়ে ওঠা কি সোজা রে? পারবি তো?'

গোবর্ধন বলে—'ওঠার চেয়ে নামাই সুবিধে বোধহয়। সর-সরিয়ে নেমে পড়লেই হল।'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—'তা বটে। কিন্তু না উঠলে নামবি কী করে?'

'তাই করি, কী বল দাদা? বারকতক উঠি আর নামি, কেমন? বেশ মজা হবে।'

'হুঁ, খুব ভালো একসাইজ। ওতে তোর সাইজও বাড়বে। ডবোল হয়ে যাবি। দু'সাইজ হয়ে যাবে তোর। কাল থেকে ওটা করিস, আজ একবার উঠেই চট্ করে জানলাটা খুলে দে বরং। কেবল রেলে চেপে চেপে তখন থেকে গা ঝিম্-ঝিম্ করছে। ভেতরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক ততক্ষণ। কিন্তু দেখিস, সাবধান, পা ফস্‌কে পড়ে যাস না যেন।'

গোবর্ধন পাইপস্থ হয়। যুগপৎ তার হস্তক্ষেপ আর পদক্ষেপ চলতে থাকে। হর্ষবর্ধন হাঁ করে তাকিয়ে দ্যাখেন।

ছোঁড়াটা আবার গড়িয়ে পড়ে গড়বড়িয়ে না যায়!

তৃতীয় ধাক্কা
গৃহপ্রবেশ ও শেষরক্ষা

পাইপ-পথে গোবর্ধন ঊর্ধ্বলোকে অদৃশ্য হয়, হর্ষবর্ধন হ্যাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকেন—কখন জানলা-যোগে গৃহপ্রবেশের আমন্ত্রণ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যায়, তবু গোবর্ধনের দেখা নেই। হর্ষবর্ধনের ভয় হয়, অত

বড় বাড়িতে হারিয়ে গেল না তো ছোকরা! ভাবতে থাকেন, কী সর্বনাশ দেখ! ঐ প্রকান্ড বাড়ির মধ্যে হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করা কি সোজা কথা! আর তাছাড়া খুঁজবেই বা কে! এত বড় ভুঁড়ি নিয়ে ঐ খাড়া পাইপ বেয়ে ওঠা হর্ষবর্ধনের কম্ম নয়। শেষটা কি ভাই খুইয়ে আসামীর মতই তাঁকে আসামে ফিরে যেতে হবে নাকি! তাঁর চোখ-মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে আসে।

কিন্তু না—একটু পরে একতলার একটা জানলার ছিটকিনি খুলে যায়। গোবর্ধন বত্রিশ পাটি বহিষ্কৃত করে দাদাকে অভ্যর্থনা জানায়। হর্ষবর্ধনের ধড়ে প্রাণ আসে, কিন্তু গোবর্ধনের মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে যায়—'তোমার পেছনে ও কী দাদা?'

হর্ষবর্ধন পেছনে তাকিয়ে দেখেন, বিরাট জনতা। তারা যে গোবর্ধনের পাইপ-লীলা দেখবার জন্যেই দাঁড়িয়েছিল একথা তাঁর মনে হয় না,—মুহূর্তের মস্তিষ্ক-চালানায় যে বিপজ্জনক আশঙ্কার আভাস তাঁর চিত্তলোকে চম্‌কে যায় তারই আতঙ্কের ধাক্কায় তিনি পড়ি-কি-মরি হয়ে জানলার দিকে হন্যে হন। ছুটে গিয়ে জানলার অভিমুখে দুই হাত বাড়িয়ে দেন, আঁকড়ে উঠবার চেষ্টা করেন—কিন্তু কেবল হাতাহাতি করাই সার, জানলা তাঁকে আদপেই আমল দিতে চায় না। জানোয়ার বলে এতদিন যাদের ঘৃণা করে এসেছেন, মনুষ্য-পদ-বাচ্য হর্ষবর্ধন এখন তাদের প্রতিই ঈর্ষান্বিত হন—হাতকে পায়ের মত ব্যবহার করার দুর্লভ কায়দা কেবল তারাই করতলগত করেছে।

গোবর্ধন দাদার সাহায্যে অগ্রসর হয়—দাদার করমর্দন করে। গোবর্ধনের চেষ্টা থাকে দাদাকে টেনে তুলতে, দাদারও চেষ্টা থাকে ঠেলে উঠতে কিন্তু পৃথিবীর দুশ্চেষ্টা থাকে হর্ষবর্ধনকে ধরাশায়ী করবার। গোবর্ধন এবং মাধ্যাকর্ষণের ভেতর তুমুল পাল্লা চলে—হর্ষবর্ধন বেচারার প্রাণান্ত হয়। তিনি বাঁচলেও তাঁর ভূঁড়ি বোধহয় বাঁচে না এ-যাত্রা আর! এ রকম অবস্থায় মরীয়া হয়ে উঠতে মানুষের কতক্ষণ? জলে পড়লে হর্ষবর্ধন যেমন কুটোকে অবলম্বন করতে দ্বিধা করতেন না, স্থলে পড়ায় এখন তেমনি গোবর্ধনকে কুটো জ্ঞান করে ঝুলে পড়লেন। গোবর্ধন দাদার সঙ্গে সঙ্গে ভুমিসাৎ হয়।

হর্ষবর্ধন বলেন,—'পড়লি তো? এই ভয়ই করছিলাম আমি! গায়ে যদি হতভাগার একটুখানিও জোর থাকে!'

গোবর্ধন সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

'আবার তো সেই পাইপ বেয়েই উঠতে হবে? সে কি চারটিখানি কথা?'

গোবর্ধন বলে, 'আচ্ছা, আমি না হয় পাইপ বেয়েই উঠব, তুমি কিন্তু এক কাজ কর। আমি কুঁজো হচ্ছি, তুমি আমার পিঠে চড়ে উঠে পড় না!'

'পারবি তো?' হর্ষবর্ধন দ্বিধা বোধ করেন, 'দেখিস, পৃষ্ঠ-ভঙ্গ না হয়ে যায়। বাড়ি গেলে বাড়ি পাব, দাড়ি গেলে দাড়িও পাওয়া যায় কিন্তু তুই গেলে আর তোকে পাব না।' হর্ষবর্ধনের মুখের ভাব ভারী হয়ে আসে।

'তুমি ওঠ না দাদা!' গোবর্ধন দাদাকে উৎসাহিত করে, 'এ কুঁজো সে কুঁজো নয়। একি সহজে ভাঙবার? এ তোমার সেই মাটির কুঁজো না!'

'তাহলে উঠছি কিন্তু! উঠি?' হর্ষবর্ধন বারংবার পুনরুক্তি করেন—গোবরা বারংবার অনুমতি দেয়। অবশেষে আর কোন উপায় না দেখে পিঠের উপর একটা পা রাখেন, তখনই ফের নামিয়ে নেন; আবার পদক্ষেপ করেন, কেমন মায়া হয়, আবার নামিয়ে নেন।

মাটির কুঁজো নয় কিন্তু ধপাস হলেই সব মাটি!

'তাড়াতাড়ি কর দাদা!' গোবর্ধন ফিস্‌ফিস্ করে—'দেখছ না, কত লোক দাঁড়িয়ে গেছে!'

'ওদের মৎলব বুঝেছি।' হর্ষবর্ধন জবাব দেন।

'বিনে পয়সায় সার্কাস দেখে নিচ্চে!'

'উঁহু,, তা নয়। বাড়ির ভেতরে যাই, বলছি তারপর।'

'দাদা, ভারি দেরি করছ তুমি! লোকগুলো তেড়ে না আসে শেষটায়!' গোবরা অনুচ্চ কণ্ঠে ভয় দেখায়।

লোকগুলো তাড়া করতে পারে এ রকম দুঃসম্ভাবনা হর্ষবর্ধনেরও মনে হয়েছে। সুতরাং তিনি কাল-বিলম্ব করেন না, গোবর্ধনের পিঠের উপর চেপে বসে পড়েন, তারপর আর দাঁড়াতে বড় দেরি হয় না—জানলাও সহজে তাঁর নাগাল পায়। হর্ষবর্ধন-ভারে গোবর্ধন যেন আরো ঝুঁকে পড়ে—হয়ত না-মাটির কুঁজোও ভাঙবার মত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রুখে ওঠবার তরফে তার চেষ্টা থাকায় কোন রকমে ভারসাম্য হয়ে যায়।

জানলার অন্তরালে দাদার মহাপ্রস্থানের পথে গোবর্ধন একটা ঝোঝুল্যমান ঠ্যাং ধরে ফেলে। হর্ষবর্ধন ঠ্যাং নিয়েই ওঠেন, মানে, অগত্যা তাঁকে উঠতে হয়, তখন আর অন্য উপায় কী! গোবরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে যায়—অবলীলাক্রমে।

'দেখলে, কেমন দু'জনারই ওঠা হয়!' গোবরা বলে। 'পা দিয়েই পাইপের কাজ সারলাম।'

হর্ষবর্ধন সে কথার কোনো জবাব দেন না, অনাহত ভুঁড়ি এবং আহত পায়ের শুশ্রূষা করতে থাকেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে হয়—'কী সর্বনাশ! এখনও খুলে রেখেছিস? বন্ধ করে দে জানলা!'

গোবর্ধন ক্ষিপ্রগতিতে গিয়ে জানলা বন্ধ করে। 'কেন? ভয় করছ ওদের?

'করছিই তো! ওরা কারা, এখনো বুঝতে পারিসনি বুঝি?'

'না তো!' গোবর্ধন মূঢ়ের মত তাকায়।

'সেই বাসের যত লোক!'

'অ্যাঁ?' গোবর্ধন তাড়াতাড়ি একটা খড়খড়ি ফাঁক করে দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দেয়—'সত্যিই তো! সেই চীনেম্যানটা পর্যন্ত রয়েছে দাদা! দলে বেশ ভারি হয়ে এসেছে এখন!'

'এখানে থাকবার মতলবে!' হর্ষবর্ধন রহস্যটা ফাঁস করে দেন। 'বুঝেছিস? বিলকুল বিনে ভাড়ায়!'

গোবর্ধন অসন্তোষ উন্মুক্ত করে—'গাড়ি চড়লি—অমনি অমনি হাওয়া খেলি—হল। তার ওপর আবার বাড়ি চড়াও? আবদার তো কম না এদের!'

হর্ষবর্ধন জানলায় খিল এঁটে দেন—'আর ভয় নেই।'

গোবর্ধন যোগ করে—'থাক দাঁড়িয়ে সব। কতক্ষণ আর থাকবে?'

'পাইপ বেয়ে উঠবে না তো?' হর্ষবর্ধনের আশঙ্কা হয়। 'কী মনে করিস তুই?'

'উঠুক গে।' গোবরা দাদাকে ভরসা দেয়, 'চল আগে ছাদের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। থাকতে চায় থাকুক সে ছাদে। বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছি না তো—হ্যাঁ!'

দুই ভাই তড়িৎগতিতে সিঁড়ি অতিক্রম করতে থাকেন। সর্বোচ্চ দরজাটি অর্গলিত করে তবে দু'জনের দুশ্চিন্তা দূর হয়।

গোবরা বলে চলে—'এখন পাইপ বেয়ে ওঠ আর পাইপ বেয়ে নাম! বাড়িতে ঢোকার ফাঁক রাখিনি বাপু! চীনেম্যান নিয়ে এসে ভয় দেখানো হচ্ছে আমাদের! বটে? এবার চীনেম্যানগিরি বেরিয়ে যাবে সব।'

হর্ষবর্ধন কিছু বলেন না, নীরবে হাঁপান।

অনন্তর দুই ভাই বিভিন্ন ঘর পরিদর্শনে বহির্গত হন। প্রত্যেক কামরাতেই খাট, পালঙ্ক, দেরাজ, ডেস্ক, আয়না ও আলমারি, নানা প্যাটার্নের টেবিল চেয়ার ইত্যাদি নানান ফার্নিচারের ছড়াছড়ি।

'আমাদের দামি দামি কাঠ কিনে এনে ভেঙেচুরে ট্যারা বাঁকা করে কী সব করেছে দেখেছিস?' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের অভিমত জানতে চান।

গোবর্ধন ঠোঁট বাঁকায়—'কাঠের শ্রাদ্ধ কেবল!'

'সোজাসুজি চৌকি করলি, টুল করলি, চারকোণা টেবিল করলি, ফুরিয়ে গেল—কাঠ নিয়ে এত মারপ্যাঁচ কেন রে বাপু!'

'দরকার তো শোবার, বসবার, আর কখনও কদাচ দু'এক কলম লেখবার। কাজ চলে গেলেই হল।'

'হ্যাঁ, কাজ চলা নিয়ে কথা। কিন্তু এসব কী!' অকস্মাৎ যেন তাঁর পিলে চমকে যায়। 'কাঠগুলোর কী সর্বনাশ করেছে রে গোবরা! ঐ দ্যাখ একটা গোল টেবিল—মোটে তিনখানা পা!'

গোবরা বিরক্তি প্রকাশ করে—'তিন পায়া তো পদে আছে, ঐ কোণেরটা দেখেছ দাদা?'

হর্ষবর্ধন সবিস্ময়ে দেখেন, একটা টেবিলের মোটে একখানা পা—তাও আবার ঠিক মাঝখানে—তারই সাহায্যে বেচারা কোন রকমে কায়ক্লেশে দাঁড়িয়ে আছে।

গোবর্ধন বলে, 'ও টেবিল কোন্ কাজে লাগবে? ওতে কি বসা যাবে?'

হর্ষবর্ধনও সহানুভূতি জানান—'হুঁ, বসেছ কি কাৎ, আর চিৎপাৎ!'

হঠাৎ হর্ষবর্ধনের আকস্মিক উল্লাস হয়—'দেখলি, দেখলি—কেমন পদ্য হয়ে গেল! বসেছ কি কাৎ, আর চিৎপাৎ!'

দুই ভাইয়ের মনে বাল্মীকি-সুলভ আনন্দের সূচনা হয়—বাল্মীকির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হবার পরই যে রকম আনন্দ হয়েছিল বলে শোনা গেছে।

তারপর দু'ভাই একটা বড় ঘরে আসে। হর্ষবর্ধন বলেন, একটু বসা যাক।'

দুটো চার-পায়া টেবিল—যাদের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই—পাশাপাশি এখন টানা হয়। একটা হর্ষবর্ধন অধিকার করেন, আর একটায় গোবরা বসে।

'চেয়ারে গুটিসুটি মেরে বসা কি আমাদের পোষায় বাপু? ছড়িয়ে না বসলে বসার আরাম!'

'নিশ্চয়ই তো! এমন আসনে বসতে হবে যে যখন খুশি ইচ্ছে হলে শুয়ে পড়াও যায় আসনের সঙ্গে বিলাস-ব্যসন।'

'খাবার দরকারের মত ঘুমোনোর দরকারও তো মানুষের প্রতি মুহূর্তে! গোবরা, ঐ গদি-আঁটা কিম্ভূতকিমাকার চেয়ারদুটো নিয়ে আয় তো! পা রাখার অসুবিধা হচ্ছে।'

পা রাখার সুবিধার জন্যে চেয়ার আসে। দুই ভাই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকেন। সামনের প্রকাণ্ড আয়নায় হর্ষবর্ধনের প্রতিচ্ছায়া পড়ে—আয়নার ভেতরের আর বাহিরের হর্ষবর্ধনেরা পরস্পরের প্রতি তাকায় আর নিজের নিজের গোঁফে চাড়া দেয়। গোবর্ধন দাদার কাণ্ড দেখে।

অদূরদেশ থেকে জুত্যের আওয়াজ আসে। হর্ষবর্ধন অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করেন—'তারাই! বুঝতে পেরেছিস?'

'তালা ভেঙ ঢুকেছে তাহলে! কী হবে এখন?'

হর্ষবর্ধন হাল ছেড়ে দেন—'কী আর হবে! থাকতে দিতে হবে। তোদের কলকাতার যেমন হালচাল তাই তো হবে!'

গোবর্ধন প্রতিবাদ করে—'আমাদের কলকাতা! এমন কথাও বোলো না! আসামের খাসা জঙ্গল থাকতে এমন জায়গায় আবার আসে মানুষ! ছ্যা ছ্যা!' গোবর্ধন যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত হয়।

গোবরা দরজার ফাঁক দিয়ে সন্তর্পণে মুখ বাড়িয়ে দেখে, আগন্তুক মোটে একটি লোক এবং একমাত্র। তার সাহস হয়, হাঁক ছাড়ে—'কে?'

লোকটা চম্‌কে যায়, পালাবে কি দাঁড়াবে ইতস্তত করে—বিড়-বিড় করে কি যে বলে কিছুই বোঝা যায় না।

হর্ষবর্ধন সম্মুখীন হন—'অমন হ্যাঁ করে আমাদের দেখবার কী আছে? ভয় পাবারই বা কী আছে? কলকাতার লোক ভারি অসভ্য বাপু তোমরা!'

ভূত নয় অদ্ভুত-কিছু এইরকম একটা আঁচ করে এতক্ষণে লোকটার ভয় ভাঙে, তার কম্পিত অভ্যন্তর থেকে অস্পষ্ট ধ্বনি বিনির্গত হয়—'কে আপনারা?'

'পরিচয়টা দিয়ে দাও না দাদা!'

'বর্ধন কোম্পানির বড় কর্তা আর ছোট কর্তা। আমি শ্রীহর্ষবর্ধন আর ও গোবরা—।'

'উঁহু, শ্রীযুক্ত গোবর্ধন। এখন বল তো বাপু, তুমি কে? কড়িকাঠ থেকে নেমেছ বলেই মনে হচ্ছে যেন! ভুত-পেরেত নও তো?'

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে—'না,আমি কর্মচারী।' আমতা আমতা করে বটে, কিন্তু হাওয়া হয়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখায় না।

'অ্যাঁ? কর্মচারী!' হর্ষবর্ধন লাফিয়ে ওঠেন, 'বলি বাপু, এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল তোমার? শিয়ালদয়ে সকালে যাওয়া হয়নি কেন? মরি আমি, আর আমার সঙ্গেই মিশতে চাও না এতদূর তোমার আস্পর্ধা। তারপরে তুমি নাকি তবিল মেরে সটকেছ—'

'হ্যাঁ, আমরা যখন শিয়ালদয়ে নামছি তখন হাওড়া দিয়ে সটকানো হয়েছে!' গোবর্ধনেরও রোখ চেপে যায়।—'হাওয়া হয়ে গেছ হাওড়া দিয়ে!'

'যাও, তোমাকে ডিসমিস করলুম!' হর্ষবর্ধন হুকুম পাশ করেন,—

'তবিল যা মেরেছ তা মেরেছ, তা আর ফেরত চাই না। টাকা ওড়াবার জন্যেই আমাদের কলকাতায় আসা—ওটা এখানকার বাজে খরচের মধ্যেই ধরে রাখলুম।'

'হ্যাঁ, মেরে থাকো ভালোই করেছ, কিন্তু জবাব হয়ে গেল তোমার। বাস, খতম।' গোবর্ধনও রায় দিয়ে দেয়।

এতক্ষণে লোকটা কথা বলবার ফাঁক পায়—'আজ্ঞে আপনারা ভুল করছেন, আমি আপনাদের লোক নই। এই বাড়ির মালিকের কর্মচারী আমি।'

হর্ষবর্ধন হতভম্ব হয়ে যায়, উনি ছাড়াও পৃথিবীতে আরো লোক কর্মচারী রাখে—এও কি সম্ভব? কিন্তু ক্রমশ একথাটাও তাঁর বিশ্বাস হতে থাকে। তিনি নিজেকে সামলে নেন, কিন্তু গোঁ ছাড়েন না—'তাহলেও বলি বাপু, তোমার এ কী রকম আক্কেল! আমরা হলুম ভাড়াটে—আর আমাদের তালা বদ্ধ করে পালিয়েছ?'

'এটা কি উচিত?' গোবরারও কৈফিয়ৎ তলব।

লোকটা নমস্কার করে—'ও! আপনিই বুঝি মিস্টার নন্দী?'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—'উহু, নন্দী নই।'

গোবর্ধন যোগ করে—'ভৃঙ্গীও নই, আমরা হচ্ছি বর্ধন। আসামী, কিন্তু ফৌজদারির আসামী নই। আসামের লোক বলেই আসামী।'

'আসলে বাঙালী।' দাদার অনুযোগ।

লোকটা বলে—'জমিদার গোঁয়ারগোবিন্দ সিং এ বাড়ি ভাড়া করেছেন—আপনি তাঁরই ম্যানেজার মিস্টার নন্দী তো?' একটু থেমে,—'কিংবা আপনিই বাবু গোঁয়ারগোবিন্দ সিং কি না কে জানে!'

'অত শিং নাড়ছ কেন বল তো হে! আসামের হাতির দাঁত ধরে ঝুলি, শিং দেখে ভয় খাবার ছেলে নই আমরা।' গোবরা দাদার সঙ্গে যোগ দেয়—'তেরোর বারো নম্বরের এই বাড়ি আমাদের ম্যানেজার ভাড়া করে গেছে।'

লোকটা গোবরার মন্তব্যের প্রতিবাদ করে—'তাহলে আপনারা ভুল বাড়িতে এসেছেন মশাই! এ তো ও নম্বর নয়!'

'আলবৎ ওই নম্বর! নিজের চোখে দেখা, বললেই হবে?' হর্ষবর্ধন কন।

'তুমি তো ভারি মিথ্যেবাদী হে!' গোবরা বলে—'তোমার আর দোষ দেব কি, তোমাদের দেশেরই এই স্বভাব। একজন তো চিঠি লিখেছেন যে কলকাতার লোকেরা মিশুক নয়। কী রকম যে মিশুক নয় তা হাড়ে হাড়ে জেনেছি!'

'তুমি বলছ ভাড়া করিনি, বেশ ভাড়া করছি। তার কী হয়েছে! এখনই করে ফেলছি, এই দন্ডেই। গোবরা, নোটের তাড়াটা বের কর তো? কত ভাড়া তোমার?'

'কি করে আপনাকে এ বাড়ি দেব মশাই? মিঃ সিং যে বায়না করে গেছেন।'

হর্ষবর্ধন অবাক হন—'সিং-এর বয়স কত?'

'মি. সিং দাঁড়াশের জমিদার, শুনেছি খুব বুড়ো মানুষ।'

'ছেলেরাই তো বায়না করে থাকে শুনে আসছি চিরদিন—কলকাতার বুড়োমানুষেরাও আবার,—অ্যাঁ, এ বলে কীরে গোবরা?'

গোবরাও বিস্মিত হয়—'বুড়ো মানুষের বায়না! আজব শহরে এসে পড়া গেছে দাদা!'

'সে বায়না নয় মশাই, এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দাদন দিয়ে গেছেন। দুশো বত্রিশ টাকা।'

'বেশ, আমরাও না হয় দাদন দিচ্ছি। ডবল দাদন। দিয়ে সে তো গোবরা চারশো বাহাত্তর টাকা!'

গোবরা গুণে গুণে নোট দেয়—'গেল এ মাসের দাদন! আবার আসছে মাসে দেব—আবার দাদন—অবশ্য যদি থাকা হয়। মাসকাবারি এসে নিয়ে যেয়ো তোমার দাদন!'

নোটের গাদা দেখে লোকটার মুখ সাদা হয়ে যায়, সহজে কথা বেরোয় না। অনেক কষ্টে বহুক্ষণ পরে বলে 'বেশ, মি. সিং এর জন্যে অন্য বাড়ি দেখতে হবে তাহলে। তিনি আজই দাঁড়াশ থেকে রওনা হবেন কিনা! কাল এখানে এসে পৌঁছনোর কথা।'

হর্ষবর্ধন কি যেন চিন্তা করেন—'একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব বাপু? কিছু মনে কোরো না। তোমাদের এই শহরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা

কি রকম? একটা ব্যবস্থা আছেই, নইলে শহরে অ্যাতো লোক! না খেয়ে কেউ বাঁচে না নিশ্চয়ই?'

গোবর্ধন বলে, 'না খেয়ে আবার বাঁচা যায় নাকি! তুমি কী যে বল দাদা! খেতে না পেলে লোকে বাঁচতে চাইবেই বা কেন? খাবার জন্যেই তো বেঁচে থাকা।'

লোকটি জবাব দেয়—'হ্যাঁ, আছে বই কি! ভালো ভালো পাইস হোটেল আছে। সেখানে এক পয়সার ভাত, এক পয়সার ডাল, ঝাল, ঝোল, অম্বল, তরকারি, চচ্চড়ি, শুক্ত, পলতা, মাছের ঘন্ট, কপির তরকারি—সব পয়সা পয়সা! যা চাই সব এক-এক পয়সায় পাবেন।'

'কলকাতার লোকরা সব সেখানেই গিয়ে খায় বুঝি? বাঃ বেশ তো!'

গোবরা ঘাড় নাড়ে—'অনেক পয়সা খরচ হয় কিন্তু!'

'যার যেমন খুশি', লোকটা ভরসা দিতে চায়—'কেউ ইচ্ছে করলে তিন পয়সার খেয়েও চলে আসতে পারে, কেবল ভাত আর ডাল।'

'কতদূর সেই হোটেল?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন।

'একটু দূর আছে, সেই জগুবাবুর বাজারের কাছটায়।'

'দেখ, আমরা আজ অনেক খেটে-খুটে আসছি দেশ থেকে—গোবরাকে তার ওপরে আবার বাড়িতে চড়তেও হয়েছে। এত চড়াই উৎরাইয়ের পর আমাদের আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। উৎসাহও নেইকো। তুমি যদি বাপু দয়া করে এখানে আমাদের কিনে এনে দিয়ে যাও তাহলে বড়ই বাধিত হই। তোমাকে টাকা দিচ্ছি অবশ্য।'

গোবরা উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'যত রকম খাবার সব এক-এক পয়সার এনো—দুশো পাঁচশো যতরকম আছে। সকাল থেকে ভারি খিদেও পেয়েছে দাদা!'

'গোটা পাঁচেক টাকা দিলে কুলোবে? দে তো গোবরা টাকাটা!'

'খুচরো তো নেই দাদা! খুচরো নেই বলেই তো ওকে চারশো বাহাত্তরের জায়গায় চারশো আশি দিতে হয়েছে।'

'তবে তো ঐখানেই আট টাকা আছে।' হর্ষবর্ধন উল্লসিত হন, 'সত্যি গোবরা, তুই নিজের খেয়ালে কাজ করিস বটে কিন্তু এক-এক সময়ে এমন বাঁচিয়ে দিস যে তোকে কোলাকুলি করতে ইচ্ছে হয়ে যায়!'

কোলাকুলির প্রস্তাবে গোবর্ধন ভীত হয়; এত হাঙ্গামার পর যদি ঐ বিরাট ভুঁড়ির ধাক্কা সামলাতে হয় তাহলেই ও কাবার! তার উপর আবার এই খিদে পেটে!

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে সে—'তাহলে বাপু, একটু চট্ করেই আনো গে। টাকা পাঁচেকের সব পাইস খাবার, আর যে তিন টাকা বাঁচল তুমি নিয়ো। নিজে খেয়ো কিছু। কেমন?'

এ রকম কষ্ট স্বীকারে লোকটার বিশেষ আপত্তি দেখা যায় না। 'বেশ, আপনারা ততক্ষণ নেয়ে-টেয়ে নিন, আমি এসে পড়লুম বলে।' সে চলে যায়—তার পুলকিত পদধ্বনি হর্ষবর্ধনকে বিস্মিত করে।

'এখানকার লোকগুলো অদ্ভুত, একটুতেই খুশি। যা করতে বলবি তাতেই রাজি হয়ে রয়েছে, পা বাড়িয়ে তৈরী। শুধু একটু হাঁ করার অপেক্ষা!'

'তার উপর ইংরিজি বিদ্যে একফোঁটাও নেই পেটে। নাইস হোটেলকে বলছে পাইস হোটেল! নাইস মানে ফাস্‌কেলাস,—জান তো দাদা?'

'তোর জন্মাবার আগের থেকে জানি!' বলতে বলতে হর্ষবর্ধন টেবিলের উপর লম্বা হন—তাঁর হাই উঠতে থাকে।

চতুর্থ ধাক্কা

বাইশকোপে—মানে, বাইশজনের কোপে শ্রীহর্ষবর্ধন!

সেদিন বিকালের কাহিনী। দুই ভাই গভীর পরামর্শে বসেছেন। আলোচ্য বিষয়, এবার কী করা যায়? নিশ্চয়ই এখনও কলকাতায় আরো অনেক কিছু দেখবার, শোনবার, যাবার এবং চাপবার বস্তু রয়েছে, কিন্তু সে সবের

সদ্ব্যবহার করবেন কী করে? জীবনে এই প্রথম তাঁদের কলকাতায় আসা এবং এই হচ্ছে প্রথম দিন। এরই মধ্যে কলকাতার হালচাল যা তাঁরা টের পেয়েছেন সেই সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই দুই ভাইয়ের আলোচনা চলছিল।

বাস্তবিক, তাঁরাতো নিতান্ত কেউকেটা লোক নন। আসামের বিখ্যাত বর্ধন অ্যান্ড বর্ধন কোম্পানির বড় দুই অংশীদার। কলকাতায় এসেছেন ফূর্তি করতে—টাকা ওড়াতে। হ্যাঁ, এ পর্যন্ত জীবনে অনেক টাকা তাঁরা কামিয়েছেন, এবার কিছু কমিয়ে যাবেন, এই ওঁদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এজন্যে কলকাতার যত কিছু দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, গন্তব্য এবং চাপ্‌তব্য বিষয় আছে সব তাঁরা দেখবেন, শুনবেন, যাবেন এবং চাপবেন—সেজন্যে যত টাকা লাগে দুঃখ নেই। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ওঁদের স্থির সঙ্কল্প।

কিন্তু টাকা ওড়াবার জো কী! টাকা এমন চীজই নয় যে উড়িয়ে দিলেই উড়ে যাবে। গোবর্ধন একবার দুশ্চেষ্টা করেছিল দেখতে, টাকা আকাশে ছুঁড়ে দিলে উড়ে যায় কি না—কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখা গেল তা হাতেই এসে পড়ে, কিংবা হাতের নিতান্ত কাছাকাছি। তা ছাড়া কলকাতার মত জায়গায় টাকা ওড়ানো ভারি কঠিন, হর্ষবর্ধন তাঁর ভাইকে এই কথাই বোঝাতে চাচ্ছিলেন। 'দেখলি না সকালে, আমরা একশ টাকা দিয়ে মোটর ভাড়া করে অমনি হাওয়া খাওয়াতে যাচ্ছি কিন্তু লোকগুলো গায়ে পড়ে সেধে পয়সা দিতে আসে?'

গোবর্ধন ঘাড় নেড়ে জানায়—'হ্যাঁ, টাকা জিনিসটা উপায় করা সহজ, কিন্তু ওড়ানোই দেখছি কঠিন!'

'বিশেষত কলকাতার মত জায়গায়। এখানকার বোকাদের ঠকিয়ে বেশ দু' পয়সা করা যায়। লোকে যে বলে কলকাতার পথে-ঘাটে পয়সা ছড়ানো আছে—নেহাত মিথ্যে নয়!'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু আমাদের পয়সারই যে অভাব নেই, এই হচ্ছে দুঃখের বিষয়।'

'হুঁ, হঠাৎ কোন গতিকে গরিব হয়ে যেতে পারলে আবার ব্যবসা ফেঁদে এখানে বেশ বড়লোক হওয়া যেত। কিন্তু যা টাকা জমেছে, আর কি গরিব হওয়া সম্ভব?' হর্ষবর্ধন উৎসুকচিত্তে গোবর্ধনকে প্রশ্ন করেন।

ছোট ভাই দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করেছে—'এ জন্মে তো নয়!'

হতাশ হয়ে বড় ভাই চুপ করে থাকেন, খানিক বাদে উত্তেজিত হয়ে উঠেন—'তা'বলে কি এমনি করেই হাত-পা গুটিয়ে হাল ছেড়ে বসে থাকতে হবে? চেষ্টা করতে হবে না? চেষ্টার অসাধ্য কী আছে? দ্যাখ আজ কলকাতায় এসেছি—সারা দিনে আর কতই বা খরচ হয়েছে এ পর্যন্ত! এত কম খরচ হলে চলবে কেন? এই জন্যেই কলকাতায় আসা? নতুন নতুন উপায় করতে হবে না টাকা ওড়াবার? মনিব্যাগটায় দু-পাঁচ শো যা ধরে নিয়ে নে, চল্ বেরিয়ে পড়ি। দিনটা কি এমনি এমনি নষ্ট হবে?'

হর্ষবর্ধনবাবু ভ্রাতা এবং মনিব্যাগ সমবিব্যাবহারে বেরিয়ে পড়লেন, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে। বাস্তবিক, অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়া গেছে, টাকা খরচ করবার একটা পন্থা নেই গো! টাকা ওড়াবার নিত্য নতুন ফন্দি বাৎলাতে পারে এমন একজন লোক ভয়ানক বেশি মাইনে দিয়ে রাখতেও তিনি প্রস্তুত,—হ্যাঁ, এই মুহূর্তেই! এক হাজার—দু'হাজার—যা বেতন চায় নিক না!

রাস্তায় বেরিয়েই দেখলেন, একজন লোক মইয়ে উঠে তাঁদের বাড়ির দেওয়ালে প্রকাণ্ড বড় একটা ছবি সাঁটছে। ছবিটা হনুমানের—না, হনুমানের নয়, দুই ভাই ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন—ছবিটা একটা অতিকায় জাম্বুবানের। বড় বড় অক্ষরে ছবির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে—ছবির মাথায়, নিচে জাম্বুবানের বগলের মধ্যে—'কিঙ্‌কঙ্'—অত্যন্ত চমকপ্রদ রোমাঞ্চর চিত্র, রাওনক্-মহলে।'

'হুঁ, যা বলেছে! এটি যে চমকদার জাম্বুবান সে বিষয়ে ভুল নেই।'

গোবর্ধন সায় দেয়—'খুব রোমাঞ্চকরও আবার! কী বল দাদা?'

হর্ষবর্ধন লোকটিকে ডাকেন—'ওহে ব্যক্তি, শোন শোন।' মই আর ময়দার বালতি হাতে লোকটি এগিয়ে আসে। 'বেশ, বেশ ছবিটি তোমার। ভারি খুশি হলাম। একটা আমাদের বাড়ির ভেতরে গিয়ে লাগিয়ে দাও গে।'

লোকটি জানায় এসব বায়স্কোপের পোস্টার, বাড়ির ভেতরে লাগিয়ে বরবাদ করা তার এক্তিয়ার নেই।

হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে ফিস্-ফিস্ করে বলেন—'না লাগায় নাই লাগবে। রাত্রে এসে তখন চুপি-চুপি খুলে নিয়ে গেলেই হল—কী বলিস? বেশ ছবিখানা! কত বড় হাঁ করেছে দ্যাখ্! একটা বড় কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেশে নিয়ে যাব আমরা।'

গোবর্ধন কানে কানে জবাব দেয়—হ্যাঁ দাদা। আর যদি এখানে বাঁধাতে বেশি খরচ পড়ে, ছবিটার আন্দাজের একটা বড় কাঁচ কিনে নিয়ে গেলেই হবে। দেশে তো আর কাঠের দুঃখ নেই! কারিগরকে দিয়ে ফ্রেম বানাতে কতক্ষণ!'

হর্ষবর্ধন দিল্‌দরিয়া হয়ে ওঠেন—'না, না, এখানেই বাঁধাব। লাগুক না, কত টাকা লাগবে! কোথায় বৈঠকখানা রোড জানি না, কিন্তু খুঁজে নেব; সেখানে আমাদেরই কাঠের দোকান রয়েছে তো, কত চড়া দামে তারা আমাদের কাঠ আমাদেরকেই বিক্রি করে দেখাই যাক! ম্যানেজারটার কাজের বহর জানা যাবে।' তারপর গোঁফ মুচড়ে নেন—'আরে হাঁদা, আসল কথাটা কী জানিস? তোর বৌদি আসবার সময়ে বলেছিল আমার একটা ফটো তুলিয়ে নিয়ে যেতে। কোথায় ফটো তোলে জানি না তো, এই বিরাট শহরে কোথায় ফটোর কারখানা কে খুঁজে পাবে? তার বদলে যদি এই ছবিখানি বাঁধিয়ে নিয়ে যাই খুশি হবে না কি?'

গোবর্ধন গম্ভীরভাবে বিচার করে, একবার দাদার দিকে একবার কিঙ্‌কঙের দিকে তাকায়, তুলনা করে দেখে বৌদির চোখে কে অধিকতর পছন্দনীয় হবে, তারপর ঘাড় নেড়ে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানায়।

হর্ষবর্ধন লোকটিকে ডাকেন—'আর একখানা যদি না দিতে পার নাই দেবে। আমরা বাঁধাতাম কিনা! তার দরকারও নেই বড়—গোবরা হতভাগা তো বিয়েই করেনি। কিন্তু কী জান, আমরা বড়লোক কিনা, চিত্রকলার সমাঝদার আর পৃষ্ঠপোষক হতে হয় আমাদের। বড়লোক হওয়ার অনেক হ্যাপা, বুঝলে হে? যাক, আমরা দুঃখিত নই সেজন্যে। তা, ছবিখানা আমাদের বাড়ি লাগিয়েছ তার জন্যে কত দিতে হবে তোমাকে? যা চাও বল, লজ্জা কোরো না—কোনো দাম দিতেই কুণ্ঠিত নই আমরা। গোবর্ধনের মত নেন—'একশো টাকার একখানা নোট ওকে দিই, কেমন? খুব কম হবে না তো, দ্যাখ্! কলকাতা শহরে এসে মান-মর্যাদা খোয়ানো চলবে না ভাই!'

গোবর্ধন 'সেফসাইডে' থাকে, বলে, 'তাহলে দু-খানাই দাও।'

পোস্টারওয়ালা বোধহয় ঘাবড়ে গিয়েছিল, সে জবাব দেয়—'টাকা নিতে পারব না বাবু, এই হল আমাদের কাজ।'

দুই ভাই যে মর্মাহত হয়েছেন তা মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়। লোকটা সান্ত্বনা দিয়ে জানায়—'আচ্ছা, আসছে হপ্তায় আর একখানা ছবি লাগিয়ে যাব, সেটা এর চেয়ে বাচ্চা-গোছের—সান্ অব কঙ্।'

হর্ষবধনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে—'বেশ বেশ! সেই ভালো। কিন্তু সেইসঙ্গে একটা ব্রাদার অব্ কঙ্-ও আনতে পার না? এখনও আমার ছেলেপুলে হয়নি তো, তবে শ্রীমান.....' গোবর্ধনের দিকে তাকিয়ে কথাটা তিনি সেরে নিতে চান।

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের দুঃখ সহ্য করতে অপারগ। তিনি কিঙ্ কঙ্ নিয়ে অম্লান বদনে বাড়ি ফিরবেন রাজার মতই, আর ভাই খালি হাতে বিষণ্ন বদনে যাবে—এক যাত্রায় পৃথক ফল—এ চিন্তাও তাঁর অসহ্য।

লোকটা বলে—'আচ্ছা, পূছব কর্তাদের। বোধহয় ব্রাদার অব্ কঙ্ও বেরিয়ে থাকবে অ্যাদ্দিনে।'

হর্ষবর্ধন আনিচ্ছাসত্ত্বে মানিব্যাগের মুখ বন্ধ করেন—'সেদিন তোমায় টাকা নিতে হবে কিন্তু!'

গোবর্ধনও মনে করিয়ে দেয়—হ্যাঁ, সেদিন আর "না" বললে শুনছি না!'

দেয়াল-শিল্পী চলে গেলে পরে হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন—'ছবিটার মধ্যে ছোট ছোট অক্ষরে কী সব লিখেছে পড়ে দ্যাখ্ তো—ব্যাপারটা কী বলে!'

গোবর্ধন সমস্তটা পড়ে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে—'ধর্মতলায় রাওনাক্-মহলে একটা বাইশকোপ হচ্ছে, —সেখানে যেতে ডাকছে সবাইকে।'

'চল্, যাই সেখানে। অমনি নাকি?'

'উঁহু! ঐ যে লিখেছে—"বিলম্বে আসিলে টিকিট পাইবে না!" টিকিট লাগবে।'

'লাগুক না! টাকা খরচ হবে তো! বলছে যখন তখন আর বিলম্ব করে কাজ নেই, চল।'

'হনুমানের ভাই জাম্বুবান—রামায়ণে পড়নি দাদা? তারই সব কীর্তিকলাপ, বুঝেছ?'

'অনেকক্ষণ। সমস্কৃত ছবি—নাম দেখে বুঝতে পারছিস না? ঐসব অং বং। কিং কং, ততঃ কিং—এসবই হচ্ছে সমস্কৃত।'

গোবর্ধন উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'রামায়ণ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে দাদা। সেই যে তিন বছর আগে দেখেছিলাম মনে নেই তোমার? কিন্তু এ তো রামযাত্রা নয়, এ হল গিয়ে রামবাইশকোপ! তার চেয়ে ঢের ভালো নিশ্চয়।'

'মনে আছে বইকি। সে ছিল হনুমানের লঙ্কাকান্ড, এ বোধহয় জাম্বুবানের কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড-টান্ড হবে। ধর্মতলাটা কোন্ দিকে রে, জিজ্ঞাসা কর্ না কাউকে।'

'জিজ্ঞাসা করে কী হবে, ভাববে পাড়াগেঁয়ে, তার চেয়ে একেবারে মোটরে চেপে বসা যাক।' গোবর্ধনের মোটর চাপবার শখ কম নয়। 'সকালে তো একটা একতালা মোটরে চেপেছিলাম, এবেলা কত দোতালা মোটর ছুটোছুটি করছে দেখ না দাদা! ডাকব একটাকে?'

'উঁহু, মোটরে হুস্ করে নিয়ে যায়, শহর দেখা হয় না। যদি কলকাতাই না দেখলাম তো কলকাতায় এসে করলাম কী? এবেলা দোতালা মোটর বেরিয়েছে, কাল সকালে দেখবি তিনতালা, কাল বিকেলে চারতলা—কত কি দেখবি, দু-দিন থাক না, আস্তে আস্তে বেরুবে সব। ভাড়াও হবে তেমনি ডবল,তিনগুণ, চারগুণ—তা চল্লিশ কেন, একশো টাকা হোক না, আমরা বাপু কিছুতেই পিছ-পা নই।'

সগর্বে পদক্ষেপ করতে করতে হর্ষবর্ধন অগ্রসর হলেন, অগত্যা ব্রাদার অব্ হর্ষবর্ধনকেও মোটর না চাপতে পারার দুঃখ হজম করে দাদার অনুসরণ করতে হল।

চলতে চলতে হর্ষবর্ধনের দৈব্যাৎ কিসে যেন পা পড়ল, তিনি সহসা পিছলে দুশো হাত দূর গিয়ে দাঁড়ালেন। পিছলে সাধারণত লোকে পড়েই যায়, কিন্তু তিনি অবলীলাক্রমে দাঁড়িয়ে গেলেন। অকস্মাৎ তীরবেগে অগ্রসর

হবার সময় ধারণা হয়েছিল হয়ত কোন অকস্মাৎ দুর্ঘটনা ঘটছে, কিন্তু অবশেষে যখন দন্ডায়মান অবস্থাতেই রইলেন তখন তাঁর মনে হল, এ তো বেশ মজাই!

নিঃশব্দ-চলমান দাদার সমকক্ষতা বজায় রাখতে গোবর্ধনকে সশব্দে দৌড়াতে হল। হর্ষবর্ধন পায়ের তলায় তাকিয়ে দেখেন, এই দুর্নিবার গতিবেগের মূলে সামান্য একটা কলার খোসা। এরই পিঠে চেপে তিনি এ মুহূর্তে এতখানি পথ অনায়াসে উৎরে এসেছেন। কলকাতায় কলার খোসাও একটা চলতি ব্যাপার তাহলে! যানবাহনের একজন। রীতিমতন চাপ্‌তব্যই।

হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে গতিরহস্যটা বুঝিয়ে দেন—ওঃ, এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, চারিদিকেই কলার খোসা ছড়ানো রয়েছে যে! এগুলো কেন ছড়িয়েছে জানিস? চলবার সুবিধের জন্যে দেখলি না—না-হেঁটে না-দৌড়ে না-লাফিয়ে দুশো হাত এগিয়ে এলাম! এক লহমায় দুশো হাত আনাগোনা কম কথা নয় নেহাত!'

গোবর্ধন মাথা নাড়ে—'যা বলেছ! যারা মটরে যেতে পারে না তাদের জন্যেই রেখেছে বোধহয়। মোটরের মতনই বেগে যায় অথচ ভাড়া নেই এক পয়সাও! কলকাতার হালচালই অদ্ভুত!'

'আমার ভারি চমৎকার লেগেছে। এখন থেকে আমি কলার খোসা চেপেই বেড়াব, কী বলিস! কেন অনর্থক হেটে মরি! দেরিও হয় তাতে!'

'না, না, পড়ে যেতে পার দৈবাৎ!' গোবর্ধন আপত্তি জানায়।

'পাগল, আমি পড়ি কখনও! কখনও পড়তে দেখেছিস আমায়? কোনও জন্মে?'

'আমি তা'বলে অত দৌড়তে পারব না তোমার সঙ্গে!'

'সেই কথা বল!' হর্ষবর্ধন হাসতে থাকেন।

এসপ্লানেডের মোড়ে এসে হর্ষবর্ধন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন—'এবার কোন্ দিকে যাব? চারদিকেই তো রাস্তা!'

গোবর্ধন সংশোধন করে দেয়'—'উ'হু, পাঁচদিকে।'

সামনেই একটা কমলালেবুর খোসা পড়ে ছিল,হর্ষবর্ধন সেদিকে ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—'এবার একটু রকমফের করা যাক। ঐটায় চেপে যাই খানিক!' বলে যেমন না 'খোসারোহণ' করতে যাবেন, অমনি তিনি চিৎপটাং। তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে হর্ষবর্ধন অপ্রতিভ হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে গায়ের ধূলো

ঝাড়তে থাকেন, যেন পড়েননি এমনিভাবে পাশের একজনকে প্রশ্ন করেন—'জায়গাটার নাম কী মশাই?'

লোকটা খোট্টা, এক কথায় জবাব দেয়—'ধরম্‌তল্লা—জানতা নেহি?'

'ধড়াম্‌তলা—তাই বল! না পড়ে কি উপায় আছে? ঠিকই হয়েছে তবে।'

গোবর্ধনের কৌতূহল হয়, দাদার সিদ্ধান্তের কারণ জিজ্ঞাসা করে।

'সবাই এখানে ধড়াম্‌ করে পড়ে যায়। তাই জায়গাটার নাম ধড়াম্‌তলা হয়েছে, বুঝছিস না? পড়তেই হবে যে এখানে!'

'আর কদ্দুর বাপু, তোমার জাম্বুবানের বাইশ্‌কোপ। হেঁটে হেঁটে পায়ের সূতো ছিঁড়ে গেল!' গোবর্ধন বিরক্তি প্রকাশ করে।

হর্ষবর্ধন বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়েন—'আবার এদিকে খোসায় চাপাও নিরাপদ নয়কো।'

'এখানে এত ভিড় কিসের দাদা?'

'আরে, এই যে রওনক্‌-মহল! দেখছিস না লেখাই রয়েছে—ঐ যে সেই ছবিখানা রে! এখানে দেখছি একটা বড় সাইজের রঙচঙে সেঁটেছে!'

গোবর্ধন এবার সাহসী হয়ে একজনকে প্রশ্ন করে বসে—'ওই ঘুল্‌ঘুলিটার কাছে এত ভিড় কেন মশাই?'

'এখুনি টিকিট কাটা সুরু হবে কিনা!'—উত্তর দেয় লোকটা।

'ক' টাকার টিকির কাটবে দাদা?' গোবর্ধন দাদাকে প্রশ্ন কর।

'একেবারে সবচেয়ে সামনের সীট, তা যত টাকাই লাগুক।'

হর্ষবর্ধন বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গী করেন—'সেবার সনাতনখুড়ো কলকাতা থেকে দেশে ফিরল, তার কাছ থেকে সব আমার জানা। খুড়ো বলে কিনা ঠ্যাটরের সব-আগের সীটের দাম সবচেয়ে বেশি—পাঁচ টাকা করে। "ঠ্যাটর" কী বুঝেছিস?'

'না তো!'

'ঠ্যাটর হচ্ছে থিয়েটার—বুঝলি! খুড়ো কী মুখ্যু দ্যাখ্‌! তবে, খুড়োরই বা দোষ দেব কী? ইংরিজি উচ্চারণ করা কি সোজা রে দাদা!'

গোবর্ধন আবার সেই লোকটিকে প্রশ্ন করে—'মশাই, স-সামনের টিকিট কোথায় দিচ্ছে?'

লোকটি এবার বিরক্ত হয়—দেখছেন না?' ভিড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে—'ঐ তো ফোর্থ ক্লাশের টিকিট ঘর।'

হর্ষবর্ধন দু'খানা দশ টাকার নোট বের করে নিয়ে ভাইয়ের হাতে মানিব্যাগ দেয়—'ধর্ এটা, টিকিট কেটে আনি গে। থিয়েটারের পাঁচ টাকা হলে বাইশ-কোপের না-হয় দশ টাকাই হোক! এর বেশি আর কী হবে? ভিড়ের মধ্যে সেঁধুব যে, উপায় কী? সব থেকে দামি সীটের জন্যে সবচেয়ে বেশি ভিড় হবে জানা কথা।'

গোবর্ধন বলে—'হুঁ! কলকাতার লোকের টাকার অভাব নেইতো!'

নোট দু'খানা দাঁতে চেপে দু' হাতে ভিড় ঠেলে হর্ষবর্ধন ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন। মুহূর্তপরেই টিকিট-ঘরের ঘুলঘুলি খুলে গেল—খোলামাত্রাই তুমুল কাণ্ড! কথা নেই বার্তা নেই, জমাট জনতা সহসা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত উত্তাল হয়ে উঠল—চারিদিকে যেন প্রলয় নাচন শুরু হলে গেল! হঠাৎ হর্ষ-বর্ধন দেখেন তাঁদের মাথার উপরে জন-দুই লোক সাঁতার কাটছে এবং তাদেরই একজন, ডুবন্ত লোক যেমন করে কুটোকে আশ্রয় করে তেমনি করে তাঁর চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরেছে। গতিক সুবিধের নয় দেখে হর্ষবর্ধন নোট দু'খানা মুখের মধ্যে পুরলেন— কি জানি চুল ছেড়ে যদি নোট চেপে ধরে! সেই দারুণ ধস্তাধস্তির মধ্যে হর্ষবর্ধন একবার ডুব-সাঁতার দিতে চেষ্টা করলেন, দু'বার শূন্যে উঠলেন, তিনবার কাৎ হলেন, অবশেষে চারবার ঘুরপাক খেয়ে, নিজের বিনা চেষ্টায় ছিটকে বেরিয়ে এলেন; তখন তাঁর খেয়াল হল, নোট দু-খানা গোলমালে গিলে ফেলেছেন কখন।

'দেখেছিস গোবরা, জামার দশা! ফর্দাফাই! আরো দু'খানা নোট দে তো—সে দু'খানা হজম হয়ে গেছে।'

গোবরা পকেটে হাত দিয়ে অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে পড়ে, সেখানে ব্যাগের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না। এই দুর্যোগে বা সুযোগে কে পকেট মেরে সরে পড়েছে। কিন্তু তার বিস্ময় তার বিক্ষোভকে ছাপিয়ে ওঠে—'একি, তোমার কাপড় কী হল দাদা?'

তাই তো! এ কার কাপড় পরে আছেন হর্ষবর্ধন? তাঁর ছিল লাল-পেড়ে ধোপ-দূরস্ত ধুতি—এ কার আধ-ময়লা ফুল-পাড় কাপড়! কখন বদলে গেছে কে জানে!

'আজ আর টিকিট কেটে কাজ নেই দাদা! কাপড় বদলেছে এই যথেষ্ট, এবার যদি চেহারা বদলে যায়?'

ভাবনার কথা বটে! হর্ষবর্ধন বলেন—'তবে চল্ বাড়ি ফিরি। কী আর করব, বেশি খরচ করা গেল না আজ! সারা দিনে আর কটা টাকাই বা ওড়াতে পেরেছি—হজমের এই কুড়ি ধরে?' তাঁর কণ্ঠে দুঃখের সুর বাজে।

গোবর্ধন যেতে যেতে হঠাৎ দেখে, রাস্তার কোণে আর-একটা কার মনিব্যাগ পড়ে আছে, দাদার অলক্ষ্যে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পোরে। ব্যাগটা বেশ ভারি, নোটে-টাকায় নিশ্চয়ই অনেক কিছু। যাক, ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন, নইলে দাদার বকুনি ছিল। মনে মনে সে হিসেব করে, পাঁচশো যদি গিয়েই থাকে তবে সাতশো নির্ঘাত ফিরে এসেছে। টাকা-কড়ি কলকাতার পথে-ঘাটে ছড়ানো থাকে, বলে যে তা মিথ্যে নয়। সত্যিই এসব কথা! গোবর্ধন কলকাতার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হয়।

বাড়ি ফিরে হর্ষবর্ধন চায়—'দে তো ব্যাগটা!'

প্রসন্ন মুখে গোবর্ধন জবাব দেয়—'সেটা খোয়া গেছে দাদা, তবে আর-একটা কুড়িয়ে পেয়েছি, অনেক টাকা আছে তাতে!.... দেখছ কেমন পেট-মোটা ব্যাগ!.... একি! ব্যাগের আবার হাত-পা কেন? কলকাতার হালচালই অদ্ভুত! হাত-পা-ওয়ালা মানিব্যাগ! কিন্তু এর মুখ খোলে না কেন! ওমা, এ যে দেখছি মোটর-চাপা-পড়া চ্যাপ্টা একটা কোলা ব্যাঙ!'

হর্ষবর্ধন অট্টহাস্য করতে থাকেন—'যাক, বেশ হয়েছে! পাঁচশো টাকা তবু খরচ করা গেল—নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোনো যাবে আজ!'

পঞ্চম ধাক্কা

ইঁদুর-চরিতামৃত

সেদিন সকাল আটটা বেজে গেল তবু দু' ভাইয়ের ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছিল। অর্ধতন্দ্রায় হর্ষবর্ধন নানাবিধ সুখস্বপ্ন দেখছিলেন, যেমন—কেবলমাত্র কলার খোসায় চেপে পৃথিবী পরিভ্রমণ করা যায় কি না, কিংবা যদি এমন হত—

রেল লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন না চলে যদি প্ল্যাটফর্মটায় চেপে, খোলা জায়গায় হাওয়া খেতে খেতে, পায়চারি করতে করতে দিব্যি হিল্লী-দিল্লী বেড়ানো যেতে! ঠিক এমনি সুখের সময়ে (মানুষের সুখ বিধাতার সয়না!) সহসা হর্ষবর্ধনের মনে হল, তাঁর ভূঁড়ির ভার যেন অকস্মাৎ অনেকখানি বেড়ে গেছে। চোখ খুললে পাছে স্বপ্নের আমেজ টুটে যায় সেই ভয়ে হর্ষবর্ধন চোখ বুজেই ডাকলেন—গোবরা এই গোবরা!'

'উঁ!'

'দ্যাখ্‌তো আমার পেটে কী?'

চোখ না খুলেই গোবর্ধন জবাব দিল—'কী আবার?'

ইতিমধ্যে ভুঁড়ির বোঝাটিকে বেশ সচল এবং সক্রিয় বলে হর্ষবর্ধনের বোধ হতে লাগল। ব্যাপার কি? নিতান্তই কি নিদ্রার মায়া ত্যাগ করে অকালে চোখ খুলতে হবে? কিংবা খবরের কাগজের বড় বড় হরফে যাকে বলে 'ভীষণ আকস্মিক দুর্ঘটনা!'—তেমনি ভয়াবহ কিছু তাঁরই উদরের উপরে এই মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে? তাঁর ভয় হচ্ছিল চোখ খুলতে।

'দ্যাখ্ না, নড়ছে যে রে—আমার পেটে!'

'পেটে নড়ছে? পিলে-টিলে হয়ত!' গোবর্ধনও চোখ খোলার কষ্ট করতে প্রস্তুত নয়। হর্ষবর্ধন ভাবলেন গোবরা ভুল বলেনি। পিলেই হবে, নইলে পেটে আবার নড়বেটা কী? আসামের পিলে ডাকসাইটে পিলে, কলকাতায় এসে হাওয়া-বদল করে শহরের হালচাল দেখে আন্দোলন শুরু করেছে—এমন আশ্চর্য কিছু নয়! আকস্মিক ভূঁড়িকম্পের কারণ অবগত হয়ে হর্ষবর্ধন নিশ্চিন্ত হলেন, আবার তাঁর নাক-ডাকতে শুরু করল। ভূঁড়িকম্পে চাপা পড়ার ভয় নেই যখন, সে ভয় বরং পাশের লোকের কিছু পরিমাণে থাকলেও ভুঁড়ির যিনি মালিক তিনি একেবারে অকুতোভয়। সুতরাং হর্ষবর্ধন ভুঁড়তুত বিপর্যয়ে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করলেন। তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

বর্ধনেরা নিশ্চিন্ত হলেও পিলে নিশ্চিন্ত ছিল না; হঠাৎ গোবর্ধন অনুভব করল কি যেন একটা লাফিয়ে পড়ল তার পেটের উপর। ভয়ে তার সারা শরীর কুঁকড়ে গেল, কিন্তু চোখ খুলতে সাহস হল না। দাদার পিলে তার পেটে লাফিয়ে আসবে, শারীরতত্ত্বের নিয়মে এটা কি সম্ভব? সে ভয়ানকভাবে ভাবতে শুরু করল।

ইতিমধ্যে একটা ক্ষীণ আর্তধ্বনি শোনা গেল—মিঁয়াও!

পিলের ডাক! আওয়াজ শুনে গোবর্ধনের নিজের পিলে চমকে গেল; সে ধড়মড় করে উঠল—'এ যে বেড়াল, ও দাদা!' তার কণ্ঠেও চোখে বিভীষিকা, বেড়ালকে তার ভারি ভয়। হর্ষবধন উঠে বেড়ালটাকে বিপর্যস্ত গোবর্ধনের উদর থেকে সজোরে বেদখল করে ঘরের কোণে নিক্ষেপ করলেন। 'বেড়াল? বেড়াল এল কোত্থেকে! কী বি—পদ!'

বেড়ালটা তৎক্ষণাৎ ফের লাফিয়ে বিছানায় এসে উঠল—তার সেই লাফটাকে একসঙ্গে হাই এবং লং-জাম্পের রেকর্ড বলা যেতে পারে। মার্জার মহাপ্রভুর ভীত দৃষ্টি অনুসরণ করে দুই ভাই দেখলেন, ঘরের কোণে তিনটে কেঁদো কেঁদো ইঁদুর—নিশ্চিত নিরুদ্বেগে তাঁদের রাত্রে ভুক্তাবশেষের সদ্ব্যবহারে নিরত। বিছানায় বসে তিন জনে সভয়ে সেই দৃশ্য নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

ভয়ের কথাই বটে। কাবুলে ইঁদুর হয় কি না জানা যায় নি, কিন্তু কাবুলি ইঁদুর বলে যদি কিছু থাকে এগুলি হচ্ছে তাই। তারই ভায়রাভাই নিঃসন্দেহে। কাবুলি বেড়ালের সঙ্গে এরা কেমন ব্যবহার করে কে জানে, কিন্তু গো-বেচারা বাঙালী বেড়ালকে যে এরা আদপেই আমল দেয় না তা তো স্পষ্টই। মানুষদের এরা কদ্দুর খাতির করবে তাও জানা নেই, হর্ষবর্ধন নিতান্ত ভাবিত হন।

গোবরা সাহস দেয়—'ভয় কী দাদা, ওরাও তিনজন, আমরাও তো তিনজন।

হর্ষবর্ধন হতাশভাবে ঘাড় নাড়েন—'উঁহু! সম্মুখ-সমরে এই বেড়ালটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয় দেখলি না। কী রকম পালাতে ওস্তাদ! কী রকম লাফখানা দিল—বাপ্! আস্ত একটা কাপুরুষ!'

অনেকক্ষণ মাথা ঘামিয়ে কথাটা গোবর্ধনের মনে আসে—'হু', যাকে ইংরিজিতে বলে 'কাউহার্ড'; আস্ত গোরু! গোরুর পাল। যা বলেছ!'

হর্ষবর্ধন বুক ফুলিয়ে বলেন—'যদি এক-একজন করে আসে আমি ওদের ভয় খাই না। কিন্তু তা তো আসবে না, একসঙ্গে সব তাড়া করবে।'

তাহলে কী বিপজ্জনক ব্যাপারটাই না ঘটবে, ভেবে গোবর্ধন শিউরে ওঠে। একসঙ্গে তিন-তিনটে কাবুলি ইঁদুরের আক্রমণ ঠেকানো কি সহজ কথা? এ যা ইঁদুর, বেড়াল দূরে থাক, এ রকম বাহন দেখলে বাবা গণেশকেও পালাতে হত। কার বাপু প্রাণের মায়া নেই? গোবরা বলে—'বুঝেছ দাদা, এ

চীজ দেখলে গণেশ বাবাজীও পালাতেন, এমন কি, তোমার ঐ ঐরাবতও! আমরা তো ছার!'

'হুঁ', হর্ষবর্ধন গম্ভীর হয়ে ওঠেন—'আমি ভাবছি যদি তাড়া করে তাহলে কী করব। কড়িকাঠ ধরে ঝুলতে হবে দেখছি। পালাব কোথায়?'

'হ্যাঁ, দরজা তো ওরাই আগলে রয়েছে!' দুই ভাই কড়িকাঠ ধরে ঝুলছেন, বেড়ালটা দাদার কাছা আশ্রয় করে দোদুল্যমান, আর নিচে থেকে ইঁদুরদের ভয়ানক লম্ফ-ঝম্প—এই দৃশ্য কল্পনা করে গোবরার হাসি পেল। 'তাই তো, তাহলে তো ভারি মুস্কিল হল দাদা ! তুমি কি ওই ভারি দেহ নিয়ে ঝুলতে পারবে?'

বেড়ালটাও কটাক্ষে হর্ষবর্ধনের বিপুল কলেবর লক্ষ্য করল, তার মুখভাব দেখে মনে হল গোবর্ধনের মতন সেও এ বিষয়ে সন্দেহবাদী। বেড়ালের সহানুভূতি হর্ষবর্ধনের হৃদয় স্পর্শ করল।

'যদি করেই তাড়া আমি ভয় করি নাকি?' হর্ষবর্ধন তাল ঠুকে বেড়ালটার লেজ মুঠিয়ে ধরেন—'তাহলে এই বেড়ালটাকেই বাগিয়ে ধরব! বেড়ালে ইঁদুর মারে বলে শুনেছি—এই বেড়াল-পেটা করেই ইঁদুর ব্যাটাদের মেরে খতম্ করব।'

বেড়ালটা হস্তগত লেজের বিরুদ্ধে কুণ্ঠিতভাবে আপত্তি জানায়—'মিউ।'

অনাহূত ও অনাকাঙ্ক্ষিত এই চতুষ্পদ ব্যক্তিটিকে গোবরারও ক্রমশ ভাল লাগছিল। ভাল লাগবারই কথা, আসন্ন বিপদের মুখে শত্রুর সঙ্গেও আত্মীয়তা হয়। ভীষণ বন্যাবর্তে মানুষ আর বাঘ একই ঘরের চাল আশ্রয় করে পাশাপাশি ভেসে চলেছে অনেক সময়ে এমন দেখা গেছে (দেখার চেয়ে শোনা যাওয়াই সম্ভব, কেননা সেই দারুণ স্রোতের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখার লোক তখন কোথায়?)। যাই হোক, আসল কথা এই, বিপদে পড়লে বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, সুতরাং একটা বেড়ালের সঙ্গে গোবরা ভাব করে ফেলবে এ আর বেশি কথা কী?

সুতরাং সে দাদার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে—'তাহলে বেড়ালটাও যে সাবাড় হবে!'

'হয়, হোক গে। কথায় বলে, যাক শত্রু পরে পরে। ইঁদুরও যাক, বেড়ালও যাক—ওদের কাউকেই চাই নে।'

'আচ্ছা, ইঁদুরগুলো যদি এখন বিছানায় লাফিয়ে আসে দাদা?'

'কেন, তা আসবে কেন? বিছানা কি ওদের খাদ্য নাকি?'

'হ্যাঁ, গদি কাটে বলে শুনেছি। নিশ্চয় তুলো খায়। কিন্তু তা নয়, যদি বেড়ালটাকে তাড়া করে আসে?'

'অ্যাঁ; বলিস কী?' হর্ষবর্ধন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, 'তা পারে তাড়া করতে, —যে-রকম মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে বেড়ালটার দিকে! কী হবে তাহলে?' হর্ষবর্ধনের হৃৎকম্প হয়।

'তাই তো ভাবছি!'

'দে, ওকে ইঁদুরদের দিয়ে দে—পিকনিক করে ফেলুক। ওর জন্যে কি আমরাও প্রাণে মরব?'

কিন্তু বেড়ালটা বোধকরি ওদের মৎলব টের পেয়েছিল, এমন ভাবে গদিতে নখ এঁটে বসল যে টেনে তোলে কার সাধ্য! বেড়ালের সঙ্গে টাগ্ অব্ ওয়ারের প্রাণান্ত পরিশ্রমে দুই ভাই যখন ঘর্মাক্ত-কলেবর, ইঁদুর তিনটে তখন প্রাতরাশ সমাপ্ত করে নিঃশব্দে প্রস্থান করেছে। বাহুযুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তিন জনের কেউই এদিকে দৃক্‌পাত করেননি। প্রথম বেড়ালের নজরে পড়তেই সে ঘাড় ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এতক্ষণ পরে পরিষ্কার গলায় উঁচু খাদের ডাক ছাড়ল—'ম্যাঁও!'

পরমুহূর্তেই সে বর্ধনদের বাহুপাশ থেকে বিমুক্ত হয়ে বিছানা থেকে নেমে গেল, দরজা পর্যন্ত একবার টহল দিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ইঁদুরদের উচ্ছিষ্টে মনোনিবেশ করল।

বেড়ালের স্বরের তারতম্য থেকেই হর্ষবর্ধন ঘরের পরিবর্তন আবিষ্কার করতে পারলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন—'বাঁচা গেল, বাপ্! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার! ইঁদুরে বেড়াল তাড়ায়—কলকাতার হালচালই অদ্ভুত!

'শহুরে ইঁদুর দাদা! যে রকম ভাবভঙ্গী দেখলাম, মানুষেরই তোয়াক্কা করে না, তো বেড়াল! আমার তো বুক কাঁপছিল এতক্ষণ!'

'কিন্তু'—খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটে।

'হুঁ।' গোবর্ধন কি যেন ভাবতে থাকে।

'তুই কী ভাবছিলি?'

'ভাবছিলাম বেড়ালটা যে শহুরে ইঁদুর দেখে ঘাবড়েছিল তা হয়ত নয়।'

'তা নয় তো আবার কী! আমাদের কর্মচারী কী লিখেছিল? কলকাতার হালচালই এই। মেশামেশির তত বেশী পক্ষপাতী নয় এরা। এমনকি এই বেড়ালেরাও।'

'উঁহু, তা নয়; পিলেগের নাম শুনেছ?'

'শুনেছি, কী তাতে?'

'শহর-জায়গায় ভারি হয়।' গোবর্ধনের চালটা মুরুব্বিয়ানা হয়ে ওঠে—'ব্যায়রামটার নাম পিলেগ কেন জান? পিলে থেকে লেগ পর্যন্ত ফুলে ফেঁপে ওঠে—তাই পিলেগ। লেগ কাকে বলে জান তো?'

হর্ষবর্ধন দাবড়ি দেন—'যা-যাঃ. তোকে আর বিদ্যে ফলাতে হবে না! তোর মাথা!'

'উহু, লেগ মানে মাথা নয়,ঠিক তার উলটো। যাকে বলে গিয়ে পা।'

'জানা জানি, তোকে আর বলতে হবে না! ফীট মানেও পা হয়—আবার ফীট দিয়ে আমরা কাঠ মাপি, সে হল গিয়ে আর-এক ফীট।'

'আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেও ফীট হয়, সে আবার আরেকটা ফীট। কিন্তু তাতে গিয়ে তোমার লেগ হয় না—লেগে আর ফীটে এইখানেই তফাৎ।'

হর্ষবর্ধন চটে যান—'বুঝেছি রে বুঝেছি। এখন পিলেগের কথা ক'।'

'শহরের ইঁদুর, বুঝেছ, কামড়ালেই পিলেগ। বেড়ালটা কেন ঘাবড়াচ্ছিল, বুঝলে এখন? ইঁদুরের ভয়ে নয়, পিলেগের ভয়ে।'

'অ্যাঁ, বলিস কীরে?' হর্ষবর্ধন এবারে চমকে ওঠেন সত্যিই!

'শহুরে বেড়াল কত ডাক্তারের বাড়ি ওর যাতায়াত—কত ডাক্তারি কথাবার্তা শোনে, রোগ-ব্যায়রামের ব্যাপার সব ওর জানা, তাই ও সাবধান, বুঝেছ দাদা, সাবধানের বিনাশ নেই বলে কিনা!'

'তুই ঠিক বলেছিস।' হর্ষবর্ধন সোজা হয়ে বসেন। 'আজ কিংবা কালই এ বাড়ি আমাদের ছাড়তে হবে। যা ইঁদুরের উপদ্রব এখানে—কখন যে কামড়ে দেয় কে জানে! কামড়ে দিলেই হল!'

'ব্যস, তাহলেই পিলে থেকে লেগ পর্যন্ত—'

'—আগাগোড়া পিলেগ!' হর্ষবর্ধন বাক্যটা সম্পূর্ণ ক'রে মুখখানা প্যাঁচার মত বানিয়ে তোলেন। গোবর্ধনও দাদার মুখের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে বসে।

ষষ্ঠ ধাক্কা
অর্থ শ্রীভিক্ষুক দর্শন

বসে থাকতে থাকতে দুই ভাই অকস্মাৎ উৎকর্ণ হন, তাঁদেরই বাড়ির সদর দুয়ারে খঞ্জনী বাজিয়ে কে সঙ্কীর্তন শুরু করেছে।

হর্ষবর্ধন অভিভূত হয়ে বললেন, 'আহা, কে এমন হরি গুণগান করে! গোবরা, ডেকে আন উপরে, কোন মহাপুরুষ-টহাপুরুষ হবে! দর্শন করা যাক।'

নিচে থেকে গোবরার গলা শোনা যায়—'কোন মহাপুরুষ নয় দাদা, একেবারেই টহাপুরুষ।'

'তুই ডেকে নিয়ে আয়।'

খঞ্জনীধারীকে নিয়ে গোবর্ধন ঘরে ঢোকে। একজন খোঁড়া ভিখারী—সিঁড়ি ভেঙে উপরে আসতে অনেক কষ্ট, অনেক কসরৎ করতে হয়েছে তাকে। খোঁড়া দেখে হর্ষবর্ধনের দয়া হয়, তিনি সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস পান— 'ভগবান তোমাকে খোঁড়া করেছেন সে জন্যে দুঃখ ক'রো না ভাই, এ তাঁর দয়া। এ জন্মে আমাদের মত পাপী-তাপীকে হরিনাম শুনিয়ে পূণ্য অর্জন করছ, পরজন্মে তাঁর দয়ায়—'

গোবরা কথাটা পূরণ করে—'তুমি একজন সেরা ফুটবল-প্লেয়ার হবে।'

ভিখারীর মুখ বিকৃত হয়—'আর যা বলেন বাবু, তেনার দয়ার কথা বলবেননি, দয়ার জন্যেই মরে আছি! ভয় হয়, এ জন্মের ক্ষেতি সারতে পরজন্মে না চার-পেয়ে করে পাঠান আমায়!'

লোকটার বিধাতার কৃপায় অরুচি দেখে হর্ষবর্ধন ক্ষুব্ধ হন—'তুমি বোধহয়, পদ্যপাঠ পড়নি, সেই পদ্যটা—'একদা ছিল না জুতা চরণ-যুগলে, একদা ছিল না জুতা—তার পরে কী ছিল রে গোবরা?'

গোবরার ধারণা হয়, দাদা ওকে ধাঁধা পূরণ করতে বলছেন; তাই অনেক ভেবে সে লাইনটা মিলিয়ে দেয়—'মোজা পরে চলিয়া গেলাম কর্মস্থলে।'

হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন—'উঁহুঁহু! মনে আসছে না পদ্যটা—সেই কবে বাল্যকালে পড়েছি। যাই হোক, তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই, একজন লোকের একদিন পায়ে জুতো ছিল না বলে সে সেই রাগে ভগবানকে গাল পাড়ছিল, হঠাৎ দেখল আর-একজনের পা-ই নেই; তার তো কেবল জুতোই নেইকো আর একজনের জুতো থাকার প্রয়োজনই নেই! তাই দেখে তখন তার দুঃখ দূর হ'ল।'

গোবরা যোগ করে—'আর যে লোকটার পা ছিল না সে-ও অন্য লোকটার জুতো নেই দেখে অনেকটা আরাম পেল। দু'জনেই ভগবানের অপার মহিমা স্মরণ ক'রে মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।'

ভিখারীটা এই উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা কতটা হৃদয়ঙ্গম করল সে-ই জানে, কিন্তু সে-ও জোরের সঙ্গে সায় দিল—'দেবেই তো!'

তাঁর শিক্ষার ফল ধরছে দেখে হর্ষবর্ধন পুলকিত হন—'দ্যাখো! তবেই বোঝ। খোঁড়া হওয়া খুবই দুঃখের তাতে ভুল নেই, কিন্তু কানা হ'লে আরও কত কষ্ট! ভগবান যে তোমাকে—'

ভিখারী বাধা দেয়—'যা বলেছেন বাবু, আগে যখন কানা ছিলাম তখন লোকে কেবল আমাকে অচল পয়সা চালাত। সিসের সিকি দুয়ানি যতো। বাধ্য হয়ে আমায় খোঁড়া হতে হ'ল—কী করি? লোকে ভারি ঠকায়।'

হর্ষবর্ধন দারুণ বিস্মিত হন—'বল কী? তুমি কি আগে অন্ধ ছিলে নাকি?'

'তা, চোখ পেলে কী করে?' গোবরাও বিস্ময়ে বদন ব্যাদান করে।

ভিখারী আমতা আমতা করতে থাকে—'ভগবানের কেরপা! তা ছাড়া আর কী বলব মশাই!'

'তাই বল!' গোবররা আশ্বস্ত হয়। হর্ষবর্ধন বলেন—'সেই কথাই তো বলছিলাম হে! ভগবানের দয়ায় কী না হয়?'

ভিখারী তাগাদা লাগায়—'পয়সা দিন বাবু, যাই এবার। অনেক বাড়ি ঘুরতে হবে আমাকে, বেলা হ'ল।'

'আমাদের কাছে তো পয়সা নেই বাপু, নোট আছে কেবল। গোবরা—'বলা-মাত্র গোবর্ধন একখানা দশ টাকার নোট বের ক'রে আনে।

ভিখারী তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে একবার দেখে নেয়—'ওঃ দশ টাকার নোট! তা আপনারা দু'জনে দুটো পয়সা দেবেন তো বাবু? আমি ন' টাকা সাড়ে পনের আনা ফেরৎ দিচ্ছি—' বলে ঝুলি ঝেড়ে রাশীকৃত পয়সা বের করে গুণতে শুরু করে সে।

'উঁহুঁহুঁ—' হর্ষবর্ধন বাদা দেন—'তুমি গোটা নোটখানাই নাও। ওর বদল দিতে হবে না; আমরা খরচ করতেই শহরে এসেছি।'

ভিখারীর চোখদুটো ডাগর হ'য়ে ওঠে, সে অবাক হ'য়ে যায়; কিছুক্ষণ পরে সন্দেহের দৃষ্টিতে নোটখানাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে, আসল কি নকল আবিষ্কারের চেষ্টা করে। জাল নোটের ভ্যাজাল নয়তো? দেখে টেখে শেষে তার সাহস হয়—'বাবু, আপনি কি পুলিসের টিকটিকি?'

হর্ষবর্ধন স্তম্ভিত হন—'গোবরা, এ বলে কীরে? আমি টিকটিকি। কলকাতায় এসে কি টিকটিকির মত চেহারা হল নাকি আমার? আয়নাখানা আন্‌তো দেখি একবার!'

গোবরা আয়না আনতে পাশের ঘরে দৌড়োয়। বাবুর ভাবান্তর দেখে, পাছে নোটখানা কেড়ে নেয় সেই ভয়ে ভিখারীও সেই অবসরে আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

হর্ষবর্ধন আপন মনে বলতে থাকেন—'বৌ বলছিলে বটে, যেয়ো না বাপু কলকাতায়, চামচিকের মতন চেহারা হবে। কিন্তু চামচিকে না হয়ে হয়ে গেলাম টিকটিকি! আশ্চর্য!'

আয়না দেখে হর্ষবর্ধনের ধড়ে প্রাণ আসে—'নাঃ, এখনও অদ্দুর গড়াইনি।' গোর্ধন দাদাকে ভরসা দেয়, দাদার মুখে আবার হাসি খেলে—যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভিখিরীটা! লোকটা কানা ছিল কি, এখনও সেই কানাই রয়েছে!'

গোবর্ধনও সে বিষয়ে দ্বিমত নয়—'হ্যাঁ, এখনও চোখ সারেনি সম্পূর্ণ। তা নইলে তোমার মতন ইয়া লম্বা-চওড়া ভুঁড়িদার লোকটাকে বলে কিনা টিকটিকি! ছ্যাঃ!' ভিখারীর উপর সমস্ত শ্রদ্ধা তার লোপ পায়।

'কিন্তু দেখেছিস, ভিখিরি হলে কী হবে, লোকটার অগাধ পয়সা। সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকার চেঞ্জ বার করে দিচ্ছিল! কলকাতার ভিখিরিরাও কী বড়মানুষ! আসামের অনেক ধনীকেই হয়ত কিনতে পারে।'

'যা বলেছ দাদা, হাতে-হাতে ন' টাকা সাড়ে পনের আনা নগদ—চাই-কি নিরেনব্বই টাকা সাড়ে পনের আনাও বের করতে পারত হয়ত!'

'তাহলে একখানা একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে নিলি নে কেন? খুচরো টাকা-কড়ির কখন কি দরকার পড়ে বলা যায় না তো!'

'আর কী দেখলাম জান দাদা? আরো অদ্ভুত ব্যাপার!'

'কী—কী?' হর্ষবর্ধন উৎসুক হন।

'লোকটা আসবার সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল, কতো কষ্টে সৃষ্টে এল যে! কিন্তু যাবার সময় সিঁড়ি টপকে তর-তর করে নেমে গেল। ভারি আশ্চর্য কিন্তু!'

হর্ষবর্ধন বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না—'আশ্চর্য আর কি, এ কি আমাদের আসাম? এ হল গিয়ে শহর কলকাতা। এখনাকার হালচালই আলাদা।'

তিনি আয়নার মধ্যে আপনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

সপ্তম ধাক্কা
বে-দন্তবাগীশের বিবরে

সাজ-সজ্জা ক'রে দুই ভাই নগর-ভ্রমণের জন্যে বার হন। ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে গোবর্ধন হতাশ হয়ে ওঠে—'কই দাদা, তুমি যে বলেছিলে আজ সকালে তিনতালা মোটর বেরুবে? কই এখনও বেরুলো না তো!'

'বেরুবে বই কি, সবুর কর! না বেরিয়ে যাবে কোথায়? বেরুতেই হবে! তিনতালাও বেরুবে, চারতালাও বেরুবে—তবে, পাঁচতালার কথা ঠিক বলতে পারি না।'

'পাঁচতালা মোটর বোধহয় নেই।'

'কলকাতায় কী আছে আর কী নেই কিছুই বলা যায় না। সনাতন খুড়ো এই কথা বলে, বুঝলি?'

'ধুত্তোর তোমার সনাতন খুড়ো!'

'আরে, এত অধীর হচ্ছিস কেন? যদি তিনতালা মোটর এ বেলা না-ই বেরোয়, দোতালার ছাদে দাঁড়িয়ে যাব না-হয়—সেও তো তিনতালাই হবে।'

'পড়ে যাই যদি?'

'ধুর, পড়বো কেন? আমি কখনও পড়ি? তবে ধড়াম্‌তলার কাছটায় একটু সাবধান হতে হবে, জায়গাটা বড় খারাপ। আর পড়বই বা কেন? মাথার ওপর দিয়ে বরাবর তার চলে গেছে দেখছিস না?'

'দেখছি তো!'

'কেন বল্ দেখি? ধরবার জন্যে। পড়বার মুখেই তার ধরে ফেলবি, বাস।'

সত্যিই তো, যতদূর দৃষ্টি যায়—গোবর্ধন চোখ চালিয়ে দেখে—রাস্তার মাঝখান দিয়ে বরাবর তারের লাইন চলে গেছে আর তারই তলা দিয়ে

অতিকায় মোটরগুলো হুলুস্থুল হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে। সে মনে মনে দাদার বুদ্ধির তারিফ করতে থাকে, যথার্থই তার মত দাদা দুনিয়ায় দুর্লভ। 'তবে চল দাদা, চটপট একটা মোটরের ছাদে উঠে পড়া যাক। ছাদে যাবার সিঁড়িও আছে যেন দেখা যাচ্ছে। থামাব একটাকে?'

'একটু দাঁড়া।' পাশের দোকানের দিকে হর্ষবর্ধনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়—'দোকানটা এ-রকম দাঁত বের করে রয়েছে কেন দেখা যাক তো!'

উভয়ে দাঁত-বের-করা দোকানের দিকে অগ্রসর হন। 'বাবা, দাঁতের কী বাহার! দেখলে পিলে চমকায়! এটা কিসের দোকান হ্যাঁ?'

একজন সাহেবি-পোশাক-পরা ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে হর্ষবর্ধনের কথার জবাব দেন—'আমার দাঁত তুলি, দাঁত বাঁধাই। আমি ডেন্টিস্ট।'

'গোবরা তোর পোকা-খাওয়া দাঁতটা তোলাবি?'

'তা তোলালে হয়, পোকারা খেয়ে শেষ করতে কন্দিন লাগাবে কে জানে? ওদের ওপর তো বরাত দিয়ে বসে থাকা যায় না।'

'হ্যাঁ তুলেই ফ্যাল্। পরের ওপর নির্ভর করা ভাল নয়। তা, কতক্ষণ লাগবে একটা দাঁত তুলতে?'

ডেন্টিস্ট বলেন—কতক্ষণ আর? এক মিনিট; আপনি টেরটিও পাবেন না।'

'কত মজুরি?'

'মজুরি কী মশাই, ফিস বলুন!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই এক কথাই—চেঁচিয়েই বলি আর ফিস-ফিস করেই বলি। দিতে হবে কত?'

'দশ টাকা আমাদের চার্জ।'

'বলেন কী মশাই! এক মিনিটের কাজের জন্যে দ-শ টাকা! আপনি কি ডাকাত? চলে আয় আয় গোবরা, আমাদের পাড়াগেঁয়ে পেয়ে ভদ্রলোক ঠকাচ্ছেন, চলে আয়,তোর দাঁত তুলিয়ে কাজ নেই।'

গোবরাও অবাক হয়—'সত্যিই তো! মিনিটে মিনিটে দশ-দশ টাকা রোজকার, তাও আবার পরের দাঁত তুলে! শহুরে ঠক দাদা, পালাই চল এখান থেকে! আধ ঘণ্টা কাঠ চিরলে একখানা তক্তা হয়, তার দাম আট আনাও নয়; আর এদিকে এক মিনিটে দশ টাকা—তাও আবার গোটা দাঁত না, আধখানা।'

হর্ষবর্ধন আরো রুষ্ট হন—'আমরা বেড়াতে এসেছি, খরচ করতেই এসেছি তাতে ভুল নেই, কিন্তু ঠকতে রাজি নই আমরা। হ্যাঁ, যদি ন্যায্য হয় দুশো টাকা নাও, দিচ্ছি, কিন্তু ঠকিয়ে কেউ একটি পয়সাও নিতে পারবে না আমাদের হুঁ!'

মেজাজ আর ধরন-ধারনেই দাঁতের ডাক্তার বুঝতে পেরেছিলেন যে খদ্দের কেবল দাঁতালোই নয়, শাসালোও বটে। এমন মক্কেল হাত-ছাড়া করা ঠিক না; তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যদি একটা দাঁতের জন্যে দশ টাকা খরচ করতে নারাজ হয়, না-হয় দশটা দাঁতই তুলিয়ে নিক। তাঁর আপত্তি নেই, কেননা তাঁর পক্ষে তো দশ মিনিটের মামলা! তা'হলেই আর ওদের ঠকা হবে না।

নিতান্তই চলে যায় দেখে তিনি একবার শেষ চেষ্টা করলেন—'দশ টাকায় একটা দাঁত তোলানো যদি লোকসান জ্ঞান করেন, না-হয় দু'জনের দুটো দাঁত তুলে দিচ্ছি ঐ এক চার্জে।'

হর্ষবর্ধনকে দলের পাণ্ডা বিবেচনা ক'রে ডেন্টিস্ট তাঁকেই হাত করার তাল করলেন—'দেখুন, বাজার মন্দা, কমপিটিশন খুব কীন, সবই জানি, কিন্তু আমাদের রেট তো কমাতে পারি নে! বরং আপনার একটা দাঁত না-হয় অমনি তুলে দিতে রাজি আছি। এর চেয়ে আর কী কনসেশন আশা করেন বলুন?'

হর্ষবর্ধন অবাক হন—'একেবারে অমনি?'

'একেবারে।'

'পোকায় না খেলেও?'

'ক্ষতি কী?'

হর্ষবর্ধন কিন্তু আপ্যায়িত হন না। 'মশাই, আমরা কলকাতায় এসেছি, টাকা খরচ করব এ কথাও সত্যি; কিন্তু তাই বলে যে অনর্থক দাঁত খরচ ক'রে যাব এ দুরাশা আপনি মনেও স্থান দেবেন না। অমনি হলেও না।'

গোবরা বলে—'হ্যাঁ, টাকা আমাদের অঢেল হতে পারে, কিন্তু দাঁত আমাদের মুষ্টিমেয়। বাজে খরচ করবার মত দাঁত নেই আমাদের।

হর্ষবর্ধন উষ্ণ হয়ে ওঠেন—'আমাদের পাড়াগেঁয়ে দেখে আপনি হয়ত ভেবেছেন যে একটা দাঁও। কিন্তু ভুল ধারণা মশাই আপনার, যত বোকা আমাদের দেখায় তত বোকা আমরা নই! আমরাও ব্যবসা করি—কিন্তু দাঁতের নয়, কাঠের।'

গোবরা সানাইয়ের পোঁ ধরে—'হ্যাঁ, ব্যবসা করেই খাই আমরা, কাঠের ওপর করাত চালাই, তা ঠিক, কিন্তু গলায় কারো ছুরি বসাই না।'

এতক্ষণে ডেন্টিস্ট কথা বলার ফুরসৎ পান—'আমিও না। ছুরি নয়—সাঁড়াশি বসানোই আমার কাজ, তাও গলায় নয়, দাঁতে।' তিনি গোবর্ধনকে সংশোধন করে দেন।

হর্ষবর্ধন চটে যান—'তা, সাঁড়াশিই বসান আর খুন্তিই বসান কিংবা হাতাই বসান, এক মিনিটের কাজের মজুরি যে দশ টাকা দিয়ে ফেলব, এত ছেলেমানুষ পাননি আমাদের।'

গোবরা দাদার কথায় সায় দেয়—'আর হাতুড়িই বসান চাই কি!'

ডেন্টিস্ট যেন এতক্ষণে আলো দেখতে পান—'ও, এই কথা! এক মিনিটের কাজে দশ টাকা দিতে আপনাদের আপত্তি? তা,না-হয় এক ঘণ্টা

ধরে আস্তে আস্তে দাঁতটা তুলে দিচ্ছি—তাহলে তো হবে?' তাঁর প্রাণে আশার সঞ্চার হয়।

এবার হর্ষবর্ধন খুশি হয়ে ওঠেন; 'হ্যাঁ, তাহলে আপত্তি নেই। উচিত খাটুনির উচিত দাম নেবেন, এতে নারাজ হবে কে? কী বলিস তুই গোবরা?'

গোবরাও উৎসাহিত হয়—'দু-ঘণ্টা ধরে তুলুন—কুড়ি টাকা নিন—উচিত মজুরি দিতে আমরা পেছোব না। কিন্তু এক মিনিটে—জানতেও পেলাম না, বুঝতেও পেলাম না—সে কী কথা!'

ডেন্টিস্ট গোবরাকে নির্দেশ করেন—'নিন, বসে পড়ন তো ঐ চেয়ারটায়! আপনাদের অভিরুচিটা স্পষ্ট করে বললেই পারতেন গোড়ায়, এত বকাবকি হত না! দেখে নেবেন আপনি, এমনভাবে এত আস্তে একটু একটু করে তুলব যে আপনি তো টের পাবেনই, পাড়াশুদ্ধ সবাই টের পাবে যে হ্যাঁ, একটা দাঁত তুলছে বটে।'

গোবর্ধনের ভারি আনন্দ হয়—'হুঁ, পোকারাও যেন টের পায়! ভারি বজ্জাত ব্যাটারা; এমন যন্ত্রণা দেয় মাঝে মাঝে!' তাকে জিঘাংসাপরায়ণ দেখা যায়।

হর্ষবর্ধনের হাসি ধরে না—'এই তো চাই! দাঁত তোলা হবে, কাক-চিল জানতে পাবে না—সে কী কথা! পাড়াশুদ্ধ জানুক যে হ্যাঁ, একটা মানুষের মত মানুষের দাঁতের মত দাঁত তোলা হচ্ছে! নইলে দাঁত তুলে লাভ কী? কথায় বলে, হাতিকা বাৎ, মরদকা দাঁত।'

ডেন্টিস্ট বাধা দেন—'উহুঁ, ভুল হল কথাটা। মরদকা বাৎ হাতিকা—'

হর্ষবর্ধন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন—'দুইই হয়। হাতিকা বাৎ তো শোনেন নি! কী করে শুনবেন, থাকেন কলকাতায়! আমরা আসামের জঙ্গলে থাকি, আমরা জানি। দিনরাত শুনতে পাই।'

ডেন্টিস্টের চোখ কপালে ওঠে—'কেন, সেখানে কি হাতির দাঁত হয় না?'

'হয় না তা কি বলেছি?' হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে দেন, 'কথাটার মানে হল এই যে হাতির আওয়াজ যেমন জোরালো তেমনি জোর হবে পুরুষের দাঁতের। যাকে কামড়াবে তার আর রক্ষা নেই। সেই যে শক্ত ব্যামো—জল দেখলে ঘাবড়ায়—তাতেই খতম হবে নির্ঘাৎ! কী ব্যামো রে গোবরা?'

গোবরা মাথা চুলকোতে থাকে—কি হাইড্রো না ফাইড্রো—'

'হ্যাঁ, ফাইড্রো-হোবিয়া। ইংরিজি কথা মনে রাখা কি সোজা রে দাদা!' হর্ষবর্ধন আরো বিশদ করে দেন, 'বুঝলেন মশাই, দাঁতই হ'ল গে মানুষের প্রধান অস্ত্র। প্রথমে দাঁত, তার পরেই হাত।'

গোবরা নিজের গবেষণা যোগ করে—'ও দুটো কাজে না লাগলে তারপরেই পা—পালাবার জন্যে।'

বক্তৃতায় বাধা দেওয়ার জন্যে হর্ষবর্ধন ভাইয়ের উপর উত্তপ্ত হন—'কিন্তু তাই ব'লে পা কিছু অস্ত্র নয় তোমার। বরং বাহন বলতে পার, পায়ে চেপেই তো আমাদের যাতায়াত।'

পাছে দু'ভাই দোকানের মধ্যেই নিজেদের অস্ত্রবলের পরিচয় দিতে শুরু করে দেয় কিম্বা বাহন বলে বেগে বেরিয়ে যায় সেই ভয়ে ডেন্টিস্ট তাঁর মক্কেলের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন—'বসে পড়েন চেয়ারটায়। আবার তো অনেক্ষণ লাগবে দাঁতটা তুলতে!'

গোবরা বলে—'এখন কী করে হবে? এখন তো একঘণ্টা ছেড়ে এক মিনিট সময় নেই আমাদের। শহর দেখতে বেরুচ্ছি এখন, সন্ধ্যার পরে আসব। কি বল দাদা!'

'সেই ভাল। এর মধ্যে তুই বরং কাবুলি ইঁদুরের গর্তটা খুঁজে রাখিস। দাঁতটা সেই গর্তে দিলে কাবুলি দাঁত পাবি।'

'কি হবে দিয়ে? আর কি দাঁত উঠবে আমার? এ তো দুধে-দাঁত নয়!' গোবরা সন্দেহ প্রকাশ করে।

'এ জন্মে না ওঠে পরজন্মে তো উঠবে? আরে, কর্মফল তোর যাবে কোথায়!'

'তাহ'লে তো কাবুলি হয়ে জন্মাতে হয় দাদা!'

'যদি হয় তো হবে। তোর বুলি শুনিয়ে লোককে কাবু করে দিবি—মন্দ কী!'

ভবিষ্যতের কল্পনায় গোবর্ধন মুহ্যমান হয় কি না হয় ঠিক বোঝা যায় না।

ভাইকে করতলগত করে হর্ষবর্ধন অগ্রসর হন। 'আচ্ছা, আসি তাহলে ডেন্টিস্ট মশায়। কী দাঁত-ভাঙা নাম মশায় আপনার! কোনো সাহেবে রেখেছিল বুঝি? যেন ইংরিজি মনে হচ্ছে!'

'হুঁ, যা বলেছ দাদা! ডেনটিশ মেনটিশ কখনও বাঙালীর নাম হয়? পারবেন মশাই, পারবেন—আপনিই পারবেন দাঁত তুলতে। আপনাকে উচ্চারণ করতেই দাঁত উঠে আসে—সাঁড়াশির দরকার হয় না! ডেনটিশ—বাব্বাঃ! কী নাম!

অতিথিরা অন্তর্হিত হলে ডেন্টিস্ট দু-বার কাঁধের ঝাঁকি দেন—'কোথাকার আমদানি কে জানে! বাহনের সাহায্য যখন নিয়েছে, আর ফিরবে বলে বোধ হয় না। না ফিরুক, যা চমৎকার আইডিয়া একখানা দিয়ে গেছে তারই দাম দশ টাকা!'

এক ঘণ্টা পরে তাঁর দরজার ওপরে নতুন একটা সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা যায়ঃ

'দাঁতই হল মানুষের প্রধান অস্ত্র।

নিরস্ত্র লোককে শস্ত্র করাই আমাদের কাজ।

আমরা দাঁত বাঁধাই।'

ততক্ষণে দু'ভাই তিনতালা মোটরের অপেক্ষায় ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়রান হয়ে উঠেছেন। অবশেষে হর্ষবর্ধন হতাশ হয়ে পড়েন—'নাঃ, কোনো আশা নেই! বেশিতালার মোটর সব ভাড়া হয়ে গেছে আজ। তার চেয়ে এক কাজ করি, ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করা যাক। সেটাও তো একটা চাপবার জিনিস!'

গোবরার মোটরে চাপা মত, সে তেমন উৎসাহ পায় না—'দূর। ঘোড়ার গাড়িতে আবার মানুষ চাপে!'

হর্ষবর্ধন উত্তেজিত হন—'কেন চাপবে না? ঘোড়ায় চাপে, তো ঘোড়ার গাড়ি। তোর যে কেন এত মোটরের ঝোঁক—আমি বুঝি না! আমার তো নিত্যি নতুন জিনিস চাপতে ইচ্ছে করে। ঘোড়ার গাড়ি কি গাড়ি নয়? আমি ডাকছি ঐ গাড়িটাকে—এই কচুয়ান, কচুয়ান!'

ক্যোচমান গাড়ি এনে খাড়া করে। 'কোথায় যেতে হবে বাবু?'

গোবর্ধন অসন্তোষ প্রকাশ করে—'গাড়ি তো নয়, চার চাকার পিঁজরে!'

হর্ষবর্ধন ততক্ষণে ক্যোচম্যানের কেশবিন্যাস দেখে আত্মহারা—'বাঃ, তোমার খাসা চুল তো হে! কোন্ নাপিতের কাছে ছেঁটেছ?'

'নাপিত নয় বাবু, সেলুনের ছাঁট।'

'চালই তো কলে ছাঁটে জানি, আজকার চুলও কলে ছাঁটছে? কালে কারে হল কী! তা, কোথায় গেলে মেলে এই সব সেলুন-কল? একটা দেশে নিয়ে যাব তাহলে।'

'কোন কল না বাবু, সেলুন হচ্ছে চুল ছাঁটার দোকান।'

'দোকানে চুল ছেঁটে দেয়? কলকাতার হালচালই অদ্ভুত! তা বাপু, তুমি সেই দোকানে নিয়ে চল না আমাদের। আমরা তোমার মত করে চুল ছাঁটব।

ভাড়া বল,বকশিস বল, দশ টাকা দেব তোমাকে। দে তো গোবরা, একখানা নোট ওকে! নাও, আগাম নাও।' গাড়িতে চেপে হর্ষবর্ধনের স্ফুর্তি হয়, 'ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছিলাম বলেই তো চুল ছাঁটার দোকান জানলাম! কখন কিসে কার থেকে কী উপকার হয় কেউ কইতে পারে? কলকাতার মত চুল ছাঁটলে পাড়াগেঁয়ে বলে কারু সন্দেহও হবে না, কেউ আমাদের ঠকাতেও সাহস করবে না।'

গোবর্ধন গুম্ হয়ে থাকে।

'তা ছাড়া কলকাতায় এলাম, তার একটা চিহ্ন তো নিয়ে যেতে হবে, আমাদের মাথা দেখে তবু এখানকার হালচালের কিছু পরিচয় পাবে দেশের লোক্তারা কত অবাক হবে ভাব তো!'

তবুও গোবর্ধন সাড়া দেয় না।

'তাই মাথায় করে নিয়ে যাব কলকাতাকে। সারা কলকাতা তো মাথায় করে নিয়ে যেতে পারি না, তাই মাথাটা কলকাতার মত করে নিয়ে যাই।'

গোবর্ধন এবার জবাব দেয়—'কে যেন গোটা গন্ধমাদনই মাথায় করে নিয়ে গেছিল না?'

হর্ষবর্ধন কি-একটা জবাব দিতে যান, কিন্তু বাধা পড়ে; ক্যোচম্যান গাড়ির দরজা খুলে ডাকে—'নামুন বাবু, এসে পড়েছি!'

হর্ষবর্ধনের চোখ কপালে ওঠে—'সে কি! এক মিনিটও তোমার গাড়ি চাপলাম না এর মধ্যেই এসে পড়লাম!'

গোবর্ধন বলে, 'কড়কড়ে দশটা টাকা গুণে দিয়েছি নগদ!'

ক্যোচম্যান জবাব দেয়—'যেখানে যেতে বললেন নিয়ে এলাম। বিশ্বাস না হয় ঐ দেখুন দোকানের সাইনবোট।'

দুই ভাই গাড়ির দুই জানালা দিয়ে মুখ বাড়ান—সত্যিই, অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই, 'সাইনবোটে' স্পষ্ট করে বড় বড় হরফে লেখা—

"এখানে উত্তমরূপে চুল ছাঁটা আর দাড়ি
কামানো হয়।"

হর্ষবর্ধন তবু ইতস্তত করেন—'এত শিগগির এলে! তোমরা গাড়ি যে বাপু মোটরের চেয়েও জোর চলে দেখছি! গাড়ি চাপলাম, তা টেরই পেলাম না!'

গোবরাও নামতে রাজি হয় না—'তোমার কি বাপু পক্ষীরাজ ঘোড়া? একেবারে যেন উড়িয়ে নিয়ে এল!'

ক্যোচম্যান বলে—'তা যখন দশ টাকা পেয়েছি হুকুম করেন তো আপনাদের আলিপুর ঘুরিয়ে আবার এখানেই নিয়ে আসছি। কিন্তু আলিপুর গেলে একটু মুস্কিল আছে।'

'কী? কী মুস্কিল? কিসের মুস্কিল?' দুই ভাইয়ের যুগপৎ জিজ্ঞাসা।

'সেখান থেকে আপনাদের ফিরতে দিলে হয়!' ক্যোচম্যান একটু মুচকি হাসে।

গোবরা বলে—'কেন? কেন ফিরতে দেবে না? কে ফিরতে দেবে না? আটকাবে কেটা? কার অ্যাদ্দুর ক্ষমতা? আমরা পালিয়ে আসতে জানি।'

হর্ষবর্ধন অধিকতর সমীচীন হন—'উহুঁ, দরকার নেই গিয়ে! জায়গাটা বোধহয় খারাপ, প্রাণের ভয়-টয় আছে। নইলে বারণ করবে কেন? নেবে পড় গোবরা!' তিনি ভুঁড়িকে অগ্রবর্তী করেন, গোবরা পশ্চাদ্বর্তী হয়।

গাড়ি চলে গেলে গোবরা আকাশ থেকে পড়ে—'আরে, এ যে আমাদের সামনের বাড়ি গো! কাল থেকে দুশো বার এ সেলুনটা আমার চোখে পড়েছে। কেবল ভাবছি, নীল কাচের দরজা দেওয়া ঘরটা কী হতে পারে! তখন তো জানি নি এই-ই সেলুন!'

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন, 'বলিস কী!' তিনি ঘুরে দাঁড়ান। 'তাই তো! ঐ যে ও ফুটপথে আমাদের বাড়ি! আর তার পাশেই সেই ডেন্টিস্টের দোকান!'

এমন সময়ে একটি বছর পনেরর ফুটফুটে ছেলে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসে। গোবর্ধন তাকে চিনতে পারে—'তোমাকে যেন দেখেছি হে! তুমি আমাদের পাশের বাড়ির না?'

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে—'কোন্ বাড়িটা আপনাদের?'

'ঐ যে আমার ছবি সাঁটা রয়েছে—দেয়ালে—' ভুল ধরতে পেরে হর্ষবর্ধন তৎক্ষণাৎ শুধরে নেন, 'উহু,, আমার নয়, কিং কঙের ছবি সাঁটা রয়েছে ঐ আমাদের দেয়ালে—'

'দেখেছি। আর ঐ বাড়িটা আমাদের।' ছেলেটা দাঁত-বের-করা দোকানটা নির্দেশ করে, 'ডেন্টিস্ট আমার বাবা।'

'অ্যাঁ, বল কী গো? দেখি, হাঁ কর তো! একি, তোমার সবগুলো দাঁতই যে ঠিকঠাক রয়েছে! একটাও তোলেননি তো!' হর্ষবর্ধন চমৎকৃত হন।

গোবর্ধন বলে—'তোমার বাবা বোধহয় তোমাকে তেমন ভালবাসেন না?'

'তোমার দাঁতগুলো সব বাঁধনো বোধহয়?' হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ হন।

ছেলেটা ঘোরতর প্রতিবাদ করে—'বাঃ, তা কেন হবে? কখনই নয়!'

গোবরার কৌতূহল হয়—'টেনে দেখতে দেবে?'

'এই যে আমি নিজেই টানছি, দেখুন না!' ছেলেটি প্রাণপণ বলে দু'হাতে দু'পাটি আকর্ষণ করে।

তথাপি হর্ষবর্ধনের সন্দেহ থেকে যায়—'উহু, তুমি জান না যে তোমার দাঁত বাঁধানো। দু'পাটিই তোলা হয়েছে, তোমার মনে নেই তুমি ডেন্টিস্টের ছেলে, তোমার কখনও আসল দাঁত হয় নাকি?'

গোবরা বলে—'সেলুনে বুঝি চুল ছাঁটতে গেছলে?'

'না, দাড়ি কামাতে গেছলাম।'

'এইটুকুন ছেলে, তোমার দাড়ি কই হে!' বিস্ময়ে হর্ষবর্ধন বিরাট হাঁ করেন।

দাড়িহীনতার লজ্জায় ছেলেটি ম্রিয়মান হয়ে যায়—'দাড়ি আর টাকা কি অমনি আসে মশাই? কামাতে হয়। আমার কথা নয়, মাস্টারমশাই বলেন। আমার ইস্কুলের টাইম হল।'

ছেলেটি চলে যায়, দুই ভাই কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকেন। অবশেষে গোবর্ধন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে— 'কী রকম বুঝছো দাদা এই কলকাতার হালচাল?'

হর্ষবধন মাথা চুলকোতে থাকেন—'তাই তো দেখছি!'

'এ বাড়ির লোকের দাড়ি না-গজাতেই সামনের বাড়ির লোক সেলুন খুলে বসে গেছে। আজব শহর দাদা, কী বল!'

হর্ষবর্ধন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়েন—'চল, সেলুনে ঢুকি!'

অষ্টম ধাক্কা
কেশ-কর্ষণের করুণ কাহিনী

কাল থেকে গোবর্ধন নীল কাচের দরজায় নজর রেখেছে এবং ওর অন্তরালে কী ব্যাপার হতে পারে তাই নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে—সেই নীল কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য যে কোনদিন তার জীবনে

হবে, এ প্রত্যাশা তার ছিল না। নানা চেহারার, নানা বয়সের, নানা সাইজের হরেক রকম লোককে ওই দরজা ঠেলে যেতে-আসতে সে দেখেছে আর ভেবেছে, বিশ্বশুদ্ধ লোকই কি ঐ বাড়ির বাসিন্দা নাকি! কিন্তু এখন কেবল আর এক মুহূর্তের ব্যবধান—একটু পরেই ঐ রহস্যলোকের দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হবে। ডিটেকটিভ বইয়ের শেষ পাতায় এসে কিশোর পাঠকের বুক যেমন কাঁপতে থাকে, গোবর্ধনের এখন সেই দশা।

যবনিকা অপসৃত হলে দেখা যায়, ছোট্ট একটি ঘর মাত্র। তার ভেতরেই কায়দা করে খান-ছয়ের চেয়ার সাজানো—ছ-টা বিরাট আয়নার মুখোমুখি; সবকটা চেয়ারেই তখন ক্ষুর আর কাঁচির বেজায় জোর খচ-খচ! হর্ষবর্ধন ভাবেন কী আশ্চর্য, এইটুকুন ঘরে বিশ্ব-ভারতের আমন্ত্রণ! যাদের মাথা আছে আর মাথায় চুল আছে তাদের কারুরই অব্যাহতি নেই এখানে না এসে—সারা দুনিয়ার দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে এরা! কামিয়ে দিয়ে বেশ কামিয়ে নিচ্ছে। বাহাদুর বটে! গোবর্ধন কী ভাবে বলা যায় না, কী ভাবা উচিত, বোধকরি সেই কথাই সে ভাবতে থাকে।

যাওয়া-মাত্রই কর্তা-নাপিত এসে দুই ভাইকে সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে, দু'জনকে দুটো কুশন-চেয়ারে বসতে দেয়, একজোড়া মাথা ও গালের দিকে দৃষ্টিআকর্ষণ ক'রে, সবিনয়ে জানায় যে ওই দুটির 'চুলহীন ও নির্দাড়ি' হতে যা দেরি! আর, তার পরেই তাঁদের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে।

কলকাতায় আসার পর এই প্রথম অভিনন্দন লাভে হর্ষবর্ধন খুশি হ'য়ে ওঠেন। গোবর্ধনও রীতিমত বিস্মিত হয়। নীল কাচের নেপথ্যলোকের যিনি একচ্ছত্র মালিক তাঁর পর্যন্ত কী অমায়িক ব্যবহার! হ্যাঁ, শহরের হলেও এবং হাতে ধারালো ক্ষুর থাকলেও এমনি লোকের কাছেই গাল ও গলা (দাড়ি সমেত) নির্ভয়ে বাড়ানো যায়—এমন-কি এর কাঁচির তলায় মস্তক দান করাও তেমন শক্ত ব্যাপর নয়।

গোবর্ধন অবাক হয়ে লক্ষ্য করে। সত্যিই, রহস্যলোকই বটে! ওধারের আয়নার ছায়া এধারের আয়নায় পড়েছে, আর কিছুই না, কিন্তু কী আশ্চর্য! একই আয়নার মধ্যে গোবর্ধন দেখছে একশোটা ঘর, একশোটা আয়না! ঘরগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে হয়ে যেন দিগন্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। অদ্ভুত কাণ্ড! গোবর্ধন ভাবছে, এখান থেকে বেরিয়েই দাদাকে প্রস্তাব করবে, এমনি এক কুড়ি বড় বড় আয়না বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। প্রত্যেক ঘরে দুটো করে মুখোমুখি সাজিয়ে দেওয়া হবে—তাতে ঘরের সংখ্যা বাড়বে, আত্মপ্রসাদও বাড়বে সেই সঙ্গে, অথচ পয়সা খরচ করে ঘর বাড়াতে হবে না। বাড়িতে যে

আয়নাটা আছে তার সামনে দাঁড়িয়ে গোবর্ধন এখন কেবল আর-একটি গোবর্ধনকে মাত্র দেখতে পায়, কিন্তু এইরকম পলিসি করলে তখন একশোটা গোবর্ধনকে এক-সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে—গোবর্ধনের সামনের চেহারা আর পেছনের চেহারা দুই নিয়ে যুগপৎ! কী মজাই না হবে তাহলে!

যাদের চুল-দাড়ির গতি হচ্ছিল, হর্ষবর্ধন বসে বসে তাদের ভাবগতিক দেখছিলেন। অবশেষে তিনি ফিস্-ফিস্ করতে বাধ্য হন—'গোবরা দেখেছিস, লোকগুলোর মুখের ভাব খুব হাসি-হাসি নয় কিন্তু!'

'চুল-ছাঁটা কি হাসির ব্যাপার দাদা!'

'জানি, গুরুতর ব্যাপার; কিন্তু তাই বলে একখানি গোমড়া মুখ করতে হবে এ-ই বা কী কথা?'

তবে তিনি এটাও ভাবেন, এক চুল ইদিক উদিক হলে কত মানুষের মন মেজাজ বিগড়ে যায়, এখানে এখন কতো চুল এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে—সেদিকটাও তো ভেবে দেখবার।

আর, তা ভাবতে গেলে হাসি পাবার কথা কি?

গোবরা অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে—'হুঁ, লোকগুলো যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে মনে হয়!'

হর্ষবর্ধন সায় দেন—'যা বলেছিস! হাল আর মাথা দুই-ই হল এক জিনিস, দুটোরই কর্ণ আছে কিনা! মাঝিকে বলে কর্ণধার—শুদ্ধ ভাষায়, জানিস নে?'

গোবর্ধন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে—'নাপিতকেও বলা যায় ও-কথা। কর্ণধার তো বটেই, তা ছাড়া নাপিতের ক্ষুরেও বেশ ধার।'

একটা আয়নার চেয়ার খালি হয় হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণ আসে। গোবরা ত্যাগীর ভূমিকা নেয়—'দাদা, তুমিই ছাঁটো আগে আমার পরে হবে।'

হর্ষবর্ধনের ভাই-অন্ত প্রাণ, ভাইকে ছেড়ে কোন কাজে তাঁর মন সরে না। একসঙ্গে ট্রেনে উঠেছেন, ট্রেন থেকে নেমেছেন, মোটরে চেপেছেন, কলকাতার সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাঁরা একসঙ্গে আস্বাদ করছেন, অথচ চুল-ছাটার আনন্দ একা তাঁকেই প্রথম উপভোগ করতে হবে! ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ কাঁচুমাচু হয়; 'বেশ, তুই না-হয় আগে দাঁত তোলাস।' তারপর কি ভাবেন খানিকক্ষণ—'আমি না-হয় দাঁত তোলাবই না।' হ্যাঁ গোবরার দাদা-ভক্তির বিনিময় তিনি অবশ্যই দেবেন, দাঁত তোলার আনন্দ থেকে তিনি কঠোরভাবে নিজেকে বঞ্চিত রাখবেন। ভাইয়ের জন্যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার ক'রে তাঁর প্রাণ চওড়া হয়ে ওঠে। গোবরা দাদাভক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর ভ্রাতৃভক্তির তুলনাই কি পৃথিবীতে আছে?

চেয়ারে বসে চুল-ছাঁটানো হর্ষবর্ধনের জীবনে এই প্রথম। চুল ছাঁটার কথা শুনলেই চিরকাল তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে এসেছে, আর দাড়ি কামানোর সময়ে মনে হয়েছে চীনেম্যানরাই পৃথিবীতে সুখী। চীনে দাড়ির প্রাদুর্ভাব কম, হর্ষবর্ধনের ধারণা সে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের এই হচ্ছে একমাত্র কারণ।

হ্যাঁ দাড়ি কামানোর সময়ে হর্ষবর্ধনের মনে হয়েছে, এর চেয়ে চীন দেশে জন্মানো ভাল ছিল। আসামের গাছ-পালা রেহাই পেত, তিনিও রেহাই পেতেন। দেশি নাপিতকে যদি বলেছেন—'দাঁড়িটা আর একটু ভিজিয়ে নাও হে—বড্ডো লাগছে', অমনি তার জবাব পেয়েছেন, 'দরকার হবে না বাবু, আপনার নয়নজলেই সেরে নিতি পারব।' বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজের দাড়ির উপর অশ্রুবর্ষণ করতে হয়েছে। যদি বলেছেন, 'তোমার ক্ষুরটা ভারি ভোঁতা বাপু!' অমনি বাপুর উত্তর—'ডবল খাটুনি হল তার দ্বিগুণ মজুরি দিন তাহলে।' সুতরাং আর-এক দফা অশ্রুবর্ষণ। আর চুল ছাঁটার কথা না তোলাই ভাল। উবু হয়ে বসে খবরের কাগজের মাঝখানে ফুটো করে মাথা গলিয়ে ঝাড়া দু'ঘণ্টা সে কী কর্মভোগ! চুলের সঙ্গে কাঁচির সে কী ঘোরতর সংগ্রাম—আবার অনেক সময়ে ঠিক চুলের সঙ্গেই না, মাথার খুলি, কানের ডগা, খোদ হর্ষবর্ধনের সঙ্গেও। কাঁচির খোঁচা খেয়ে হর্ষবর্ধন ক্ষেপে ওঠে; ইচ্ছা হয় নাপিতকে মনের সাধে দু'ঘা দেন কসিয়ে—কিন্তু দারুণ বাসনা তিনি দমন করে নেন। নাপিতকে মারা আর আত্মহত্যা করা এক কথা, কেননা এমন সুযোগ প্রায়ই আসে যখন নাপিতের ক্ষুর আর গলার দূরত্ব খুব বেশি থাকে না। অনেক ভেবে হর্ষবর্ধন নাপিতকে মার্জনা করে ফেলেন। বিবেচক হর্ষবর্ধন।

কিন্তু প্রাণ নিয়ে পরিত্রাণ পেলেও চুল নিয়ে কি পরিত্রাণ আছে সেসব-নাপিতের কাছে? অনেক ধস্তাধস্তি করে মাথায়-মাথায় হয়ত রক্ষা পান, কিন্তু চুলের অবস্থা দেখে হর্ষবর্ধনের কান্না পায়—আয়নায় যেটুকু স্বচক্ষে দেখা যায় সে তো শোকাবহ বটো, যে অংশ'পরস্ব' চোখে জানতে হয় তার রিপোর্টও কম মর্মভেদী হয় না। এধারে খপচানো, ওধারে খপচানো, কাকে-ঠোকরানো, বকে-ঠোকরানো—যত দিন না চুল বেড়ে আবার ছাঁটবার মতন হয়েছে তত দিন সে মাথা মানুষের কাছে দেখাতে মাথা কাটা যায়। এই হেতু কাঁচি-হাতে নাপিতের আবির্ভাব দেখলেই হর্ষবর্ধনের জ্বর আসে, মাথা ধরে, ঘাম হয়, পেট কামড়াতে থাকে—এমন কি বমি করে বসেন! ঠিক যে-সব উপসর্গ ছেলেবেলায় পাঠশালায় যাবার আগে অনিবার্যরূপে দেখা দিত।

কিন্তু সে চুল-ছাঁটার সঙ্গে এ চুল-ছাঁটার তুলনাই হয় না। এ কেমন চেয়ারে বসে সাদা চাদর জড়িয়ে (যাতে একটিমাত্র পলাতক চুলও তোমার

কাপড়-জামার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করতে না পারে) দস্তুরমত আরাম! ঘণ্টাখানেক চোখ বুজে ঘুমিয়েও নিতে পার, জেগে দেখবে তোফা চুল ছেঁটে দিয়েছে—ঠিক কচুয়ানদের মতই। তুমি কচুয়ান নও বলে যে তোমাকে কম খাতির করবে তা নয়—কোনরকম উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই এ সব শহুরে নাপিতের কাছে। যে ঘোড়ার গাড়ি হাঁকায় না তাকেও এরা মানুষ বলেই গণ্য করে। কেন, হর্ষবর্ধনকে কি এরা কম খাতির করেছে? ঢোকবা মাত্রই কত সাদর সম্ভাষণ—ডেকে চেয়ারে বসানো—সম্বর্ধনা কি কিছু কম করেছে এরা? তবু তো হর্ষবর্ধন কচুয়ান নন। হর্ষবর্ধন গ্যাঁট হয়ে বসে পড়েন চেয়ারে, আরামে গা এলিয়ে দেন। মাথার উপরে হু-হু করে পাখা ঘুরছে—সম্মুখে নিজের চেহারা দেখবার সুবর্ণ সুযোগ—হর্ষবর্ধন স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। মুখখানা হাসি হাসি করে তোলার সাধ্যমত চেষ্টা করেন তিনি। নাপিত একটা নতুন ধরনের কাঁচি হাতে নেয়, কাঁচির কলেবর দেখে হর্ষবর্ধন অবাক হন। কাঁচি না বলে তাকে চিরুনিও বলা যায়, তার মুখের দিকে চিরুনির মত দাঁত আর হাতলের দিকটা অবিকল কাঁচি! হর্ষবর্ধন বস্তুটির মনে মনে নামকরণ করেন—'কাঁচিরুনি'। নাপিতকে প্রশ্ন করেন—'অদ্ভুত কাঁচি তো!'

'কাঁচি নয়, ক্লিপ।' নাপিত উত্তর দেয়। 'পেছনটা ক্লিপছাঁটা হবে তো?'

'যেমন কলকাতার দস্তুর তাই কর।'

ঘাড়ের পেছনে ক্লিপ চলতে থাকে, হর্ষবর্ধন শিউরে শিউরে ওঠেন। যন্ত্রটা তেমন আরামপ্রদ নয়। যেন ঘাড়ের চামড়া একেবারে চেঁছেপুছে নেয়, চুলগুলোকে যেন গোড়া থেকে সমূলে উপড়ে তোলে। কখনও ঘাড় কোঁচকান, কখনও টান করেন, কখনও কাত করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সুবিধা করতে পারেন না। অবশেষে মরীয়া হয়ে তিনি লাফিয়ে ওঠেন,—'থামাও তোমার কিলিপ! ঘাড় গেল আমার! এ যে দেখছি আসামী কাঁচির বাবা!'

নাপিত ঘাড় ধরে বসিয়ে দেয়, কোন উচ্চবাচ্য না করেই। তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। পাড়াগেঁয়ে যারা প্রথম চুল ছাঁটায় তারা সবাই এইরকমই করে কিন্তু পরে আবার তারাই চেহারার খোলতাই দেখে খুশি হয়ে আশাতীত বখশিস দিয়ে ফেলে। ক্লিপ চলতে থাকে, হর্ষবর্ধন একবার কাতর নেত্রে গোবর্ধনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু কী করবেন, ভাগ্যের কবল থেকে কারু কি নিষ্কৃতি আছে! তিনি অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেন। গোবরা তাকিয়ে দেখে, দাদার হাসি-হাসি মুখভাব বেশ কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসেছে এখন। নাপিতের হাত থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নীল দরজা ভেদ করে সবেগে

প্রস্থান করবে কি না সে ভাবতে থাকে। আপন মনে গজরায়,—'আসলে হল খুরপি, নাম দিয়েছেন কিলিপ! তা, খুরপি চালাবে তো বাগানে চালাও গে না! পরের ছেলের মাথায় কেন বাপু?'

পেছন শেষ করে সামনে ছাঁটাই শুরু হয়, কিলিপের স্থান অধিকার করে কাঁচি। সামনের চুল যেমন তেমনই থাকে, কেবল ডগাগুলো সামান্য ছেঁটে সমান করে দেওয়া। কাজ সমাধা হয়েছে জানিয়ে, পছন্দ হয়েছে কি না নাপিত প্রশ্ন করে। হর্ষবর্ধন সেই প্রশ্ন গোবর্ধনের প্রতি নিক্ষেপ করেন।

গোবর্ধন প্রাণপণে পর্যবেক্ষণ করে, কিন্তু চুল-ছাঁটাটা কোন্ জায়গায় হল খুঁজে পায় না। সামনের চুল তো ছোঁয়াই হয়নি, আর পেছনটা দিয়েছে খুরপি দিয়ে একদম ন্যাড়া করে। সমান করে আঁচড়ালে সামনে দাড়ি পর্যন্ত ঢাকা পড়বে—নাক-মুখই দেখতে পাওয়া যাবে না, আর পেছনে তো মাথার খুলিই বেরিয়ে পড়েছে, খোলাখুলি সেই সাদা চামড়া ঢাকতে পরচুলোই পরতে হয় কি না কে জানে! গোবরা স্বাধীন অভিমত দেয়,—'সামনে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ।'

'হুঁ, সামনেটা একটু কমানো দরকার।' হর্ষবর্ধন মন্তব্য করেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর আশঙ্কা হয়, কমাতে বললে হয়ত কাঁচি ছেড়ে কিলিপ দিয়ে কামাতে শুরু করে দেবে। ভয়াবহ যন্ত্রটার দিকে বঙ্কিম কটাক্ষ করে তিনি বলেন,—'না, থাক।'

'তাহলে হেয়ার ড্রেস করি?' নাপিত হর্ষবর্ধনের অনুমতির অপেক্ষা রাখে। হর্ষবর্ধন মনে মনে আলোচনা করেন, হেয়ার মানে তো চুল, অবশ্য খরগোসও হয় কিন্তু এখানে চুলই হবে, কিন্তু ড্রেস করবে—সে আবার কী! চুলে কাপড় পরাবে নাকি? তিনি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেন,—'কিলিপের ব্যাপার স্যাপার নয় তো?'

'না না, মাথায় গোলাপ-জল দিয়ে—'

'তা দাও, তা দাও।' ঘাড়ের পেছনটা তখন থেকে ভারি জ্বলছিল, জল পড়লে হয়ত ঠাণ্ডা হতে পারে ভেবে হর্ষবর্ধন উৎসাহিত হন, বলেন, 'আচ্ছা, চুলে না ছাঁটলে বুঝি তোমরা গোলাপ-জল খরচ কর না—না?' নাপিত ঘাড় নাড়ে। 'কর? বটে? আহা, তা জানলে আমি ড্রেস হেয়ারই করাতাম, তাহ'লে চুল ছাঁটতে আগাতো কোন্ হতভাগ্য!'

নাপিত গোলাপ-জল দিয়ে চুলগুলো ভিজিয়ে দেয়, দিয়ে চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে আঙুল চালায়। হর্ষবর্ধনের আরাম লাগে, ঘুম পায়। কিন্তু ক্রমশই

নাপিতের 'ড্রেস হেয়ারের' জোর বাড়তে থাকে, তার আঙুল-গুলো হয়ে ওঠে যেন লৌহঘটিত—সে তার সমস্ত বাহুবল প্রয়োগ করে হর্ষবর্ধনের খুলির ওপর। হর্ষবর্ধন লাফাবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না, লাফাবেন কী করে? পায়ের জোরে মানুষ লাফায় বটে, কিন্তু লাফাতে হলে পা ও মাথা একসঙ্গে তুলতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর শ্রীচরণ স্বাধীন থাকলে কী হবে, মাথা যে নিতান্তই বে-হাত! মাথা বাদ দিয়ে লাফানো যায় না। হর্ষবর্ধন আর্তনাদ করেন,—'এ কী হচ্ছে? এ কী হচ্ছে? এ কী রকম তোমাদের ড্রেস-হেয়ার? এ তো ভাল নয়!'

খোট্টারা যেমন প্রবল পরাক্রমে বর্তন মলে, গোবর্ধন দেখে, সেই তালে দাদার ড্রেস হেয়ার চলছে। সে বিরক্তি প্রকাশ করে,—'এ কি বেওয়ারিশ মাথা পেয়েছ যে চটকে-মটকে দিচ্ছ?'

নাপিত এ সব কথায় কান দেয় না, তার কাজ করে যায়। সে কখনও রগ্ টিপে ধরে, কখনও মাথায় থাবড়া মারে, কখনও সমস্ত চুল মুঠিয়ে ধরে গোড়া ধরে টানে, কখনও দু'ধার থেকে টিপে মাথাটা চ্যাপটা করার চেষ্টা পায়, কখনও ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দেয়—তার দেহের সমস্ত শক্তি এখন করতলগত। হর্ষবর্ধনের বাধা দেবার ক্ষমতা ক্রমেই কমে আসে, তিনি নির্জীব হয়ে পড়েন। তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়,—'গোবরা, তোর বৌদিকে বলিস আমি সজ্ঞানে কলকাতা-লাভ করেছি!' এর বেশি আর তিনি বলতে পারেন না। কিন্তু গোবরা বুঝতে পারে দাদার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, দাদাকে সজ্ঞানে আসাম-লাভ করাতে হলে এই মুহূর্তেই এখান থেকে সটকান দিতে হবে। সে যেন ক্ষেপে যায়—'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি আমার দাদাকে; নইলে ভাল হবে না!'

নাপিত হতভম্ব হয়ে হস্তচালনা থামায়।

'এমনিভাবে মাথাটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ, এর মানে কী?'

'চুলের গোড়া শক্ত হয় এতে।'

'চুলই রইল না তো চুলের গোড়া! টেনে টেনে তো আর্ধেক চুল ওপড়ালে, মাথায় চুল কোথায় আর?'

'এ রকম করলে মাথা ছেড়ে যায়।'

'মাথা ছেড়ে যায়?' গোবরা যেমন অবাক হয়, তেমনি চটে। 'ছেড়ে যায়? ছেড়ে গেলে তুমি জোড়া দিতে পারবে?'

নাপিত কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। গোবরা কণ্ঠে আরো জোর খাটায়,—'যে মাথা তুমি দিতে পার না সে মাথা নেবার তোমার কী অধিকার?'

হর্ষবর্ধন ঘেরাটোপের ভিতর দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে ক্লিপটা হাতাবার চেষ্টা করেন,—'গোবরা, সহজে না ছাড়ে যদি তাহ'লে দে এই যন্তরটা ওর ঘাড়ে বসিয়ে! মজাটা টের পাক।.... মাথা ছাড়িয়ে দেবেন—ভারি আবদার আমার!'

গোবরা বলে,—'না, দরকার নেই ঝগড়াঝাটির। এই নাও তোমার মজুরি দশ টাকা। দেশে চুল ছাঁটতে দশ পয়সা—কলকাতায় না-হয় দশ টাকাই হবে, এর বেশি তো না? দাদা, আর দেরি ক'রো না, উঠে এস! চল পালাই! পালিয়ে যাই এখেন থেকে এক দৌড়ে।'

দুই ভাই নাপিতকে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ দেয় না, চক্ষের পলকে সেলুন পরিত্যাগ করে।

বাইরে এসে হর্ষবর্ধন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। হতাশভাবে মাথায় হাত বুলোন,—'সত্যিই তো, টাক ফেলে দিয়েছে দেখছি! যাক, খুব রক্ষা পাওয়া গেছে! একেবারে মাথায় মাথায়! আরেকটু হলে মাথাটাই ফেলে আসতে হত!'

গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে,—'এরা পেছনের চুল দেয় দাড়ি কামানো করে আর সামনের চুলগুলো দেয় উপড়ে—একেই কি বলে চুলছাঁটা? আজব শহরের অদ্ভুত হালচাল!... অ্যাঁ, এত লোক জমছে কেন চারদিকে?'

দুই ভাইকে কেন্দ্র করে ক্রমশই জনতা ভারি হতে থাকে। হর্ষবর্ধন ফিস-ফিস করে বলেন,—'দু'জনের দু'রকম চুল দেখে অবাক হচ্ছে বোধহয়?'

'উহু', গোবরা অনুচ্চ কণ্ঠে জানায়, 'তোমার বোরখাটা খুলে ফেলনি এতক্ষণেও?'

পালাবার মুখে ঘেরাটোপ ফেলে আসার অবকাশ সামান্যই ছিল, কিন্তু সেটাকে তখন পর্যন্ত গায়ে জড়িয়েই রেখেছেন হর্ষবর্ধন। এতক্ষণে খেয়াল হল। সত্যিই, লোকে যা বলে মিথ্যা নয়, অদ্ভুত কলকাতার হালচাল! ঘেরাটোপ খুলে ফেলতেই জনতা আপনা থেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, কোন উচ্চবাচ্য করল না।

চাদরটা গুটিয়ে বগলে চেপে হর্ষবর্ধন বলেন,—'এই দ্যাখ্!' তাঁর হাতে সেই ভয়াবহ ক্লিপটা। 'আমি ইচ্ছে করে আনিনি, পালাবার সময় আমার হাতে ছিল। কী করব? ফেরত দিয়ে আসি?'

'আর যায় ওখানে?' গোবরা ভয় দেখায়—'আবার যদি শুরু করে দেয়?'

'তবে থাক এটা। দেশে গিয়ে দীনু নাপিতকে দেখাব। এবার যে ব্যাটা আমার চুল ছাঁটতে আসবে দেব এটা তার ঘাড়ে বসিয়ে—তা কলকাতার নাপিতই কি আর আসামের নাপিতই কি!'

'বেশ করেছ এটা নিয়ে এসে। কলকাতার বহুৎ লোক তোমাকে চার পা তুলে আশীর্বাদ করবে। অনেকের ঘাড় বাঁচিয়ে দিলে!'

হর্ষবর্দন মাথা নাড়েন,—'যা বলেছিস তুই! একখানা মানুষমারা কল! ক্লিপটা দিয়ে একবার পিঠ চুলকে নেন তিনি। 'যাক, ঘামাচি মারা যাবে এটা দিয়ে।'

'বৌদি কাক তাড়াবে এই দেখিয়ে। কাকের উৎপাত থেকে বাঁচা যাবে তাহ'লে। মানুষ এ দেখলে ভয় খায় আর কাক খাবে না? কী বল দাদা?'

'তখন থেকে ঘাড়টা কী জ্বলছে যে! মাথাটাও টাটিয়ে উঠেছে! চুল নিয়ে কি কম টানাটানি করেছে লোকটা? ইস্‌কুলের সেই যে কি ইসপোট হয় জানিস না... সেই যেরে... ঐ কাছি ধরে টানাটানি। প্রায় তার কাছাকাছি।'

'হু, ওয়ার অব্ টাগ।'

হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে বিশদ করেন,—ওয়ার মানে যুদ্ধ—বালিশের ওয়াড়ও হয় আবার,—সে আলাদা ওয়াড়—'

গোবর্ধন বাধা দেয়,—'কেন, আলাদা হবে কেন? আমরা ছোটবেলায় বালিশ নিয়ে যুদ্ধ করিনি? কত বালিশের তুলো বের করে দিলাম!'

'দূর মুখ্যু, বালিশের ওয়াড় বুঝি ওকে বলে? বালিশের জামাকে বলে বালিশের ওয়াড়, তাও জানিস না? ওয়ার অব্ টাগ,—অব মানে হল 'র' আর টাগ? টাগ মানে কী?'

'কী জানি! টক-ফাক হবে।'

'তাই হবে বোধহয়। ওয়ারের চোটে প্রায় টাক পড়ে গেছে আমার! হ্যাঁ, কথাটা হবে ওয়ার অব্ টাক, বুঝলি? লোকের মুখে মুখে 'টাক' 'টাগ' হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

গোবরা মুখখানা গম্ভীর করে,—উঃ, কাল থেকে কী টেকো লোকই না দেখছি রাস্তায়! কলকাতার লোকের এত টাক কেন বোঝা গেল এখন।'

'কেন?'

'এইসব দোকানে চুল ছাঁটিয়ে—এই ছাটার জন্যেই। দু-বার ছাঁটলেই টাক—চাঁদি চক্‌চকে বিলকুল সব পরিষ্কার! চুল ছাঁটালেই চুল ধরে টানতে দিতে হবে—এই হল গিয়ে কলকাতার নিয়ম।'

'বলিস কী! ভাগ্যিস গোঁফ ছাঁটিনি! তাহ'লে কী সর্বনাশই না হত!' হর্ষ-বর্ধন সভয়ে গোঁফ চুমরান। গোঁফ তাঁর ভারি আদরের এবং এই হচ্ছে তাঁর একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি যার ভাগ ইচ্ছা থাকলেও তাঁর ভাইকে দেবার তাঁর উপায় ছিল না।

নবম ধাক্কা
আনন্দবাজারের আনন্দ-সংবাদ

যতদূর সম্ভব এবং নাপিতের সাধ্য নিশ্চুপ তো হয়েছেন, অতঃপর কী করা যায় এই কথাই হর্ষবর্ধন ভাবছিলেন। দ্রষ্টব্য দেখতেই তিনি বাড়ি থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন, অবশেষে এখানে এসে চাপ্‌তব্য জিনিসেরও সাক্ষাৎ পেলেন—মোটর গাড়ি থেকে মায় কলার খোসা পর্যন্ত চাপতে কিছুই আর বাকি রইল না—এমনকি যা তাঁর দুঃস্বপ্নেরও দূর-গোচর ছিল এমন ভয়াবহ সেই ছাঁট্‌তব্য কাজটাও তিনি এইমাত্র সমাধা করে এসেছেন। অতঃপর আর কী করা যায়?

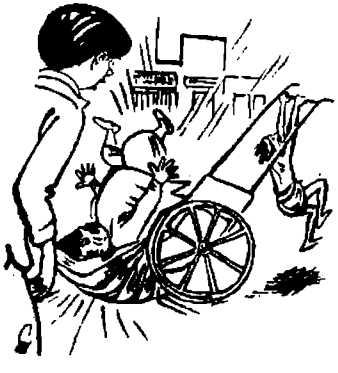

গোবর্ধনের কাছে তিনি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেন কিন্তু তার চিন্তাধারা যে অন্য পথে খেলছিল তা প্রকাশ পেতেও দেরি হল না। সে বলল,—'কেন? চাপ্‌তব্য তো কতই এখন বাকি রয়ে গেল! টেরাম আর গরুর গাড়ি তো চাপিইনি এখনো। রিক্‌শো না কি বলে—ওই যে মানুষ-টানা

দু'চাকার—ওর রসও তো এখনও টের পেলুম না। তেতালা মোটরের কথা ছেড়েই দাও। ইস্টিশনে সেই যে ট্যাক্সি না টাশ্‌কি কি বলছিল তাও চাপা হয়নি। দাদা, এস, ঐ রকম একটা পুঁচকে মোটর ভাড়া করে ঘোরা যাক ততক্ষণ।'

'থাম থাম! তোর কেবল মোটর আর মোটর!' হর্ষবর্ধন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন,—'কেন, কলার খোসায় যে চাপা গেল সেটা কি চাপা নয়? কটা লোক চাপতে পারে?'

'সে তো তুমিই কেবল চেপেছ। আমি তো চাপিনি!'

'কে বারণ করছে চাপতে? একঝুড়ি কলা কিনে ফেললেই হল! কলার খোসা মোটরের চেয়ে জোরে যায়—হ্যাঁ! চোখে-কানে দেখতে দেয় না! হুঁ!'

'তা বেশ, কেন না কেন? ওই তো ওখানে ঝুড়িতে বসে বিক্রি করছে। আমি টাশ্‌কি চেপে কলা খেয়ে খেয়ে খোসা ফেলতে ফেলতে যাই, আর তুমি পেছনে পেছনে খোসায় চেপে চেপে আসতে থাকো। আমি বরাবর জুগিয়ে যেতে পারব, খোসার অভাব হবে না তোমার, তা বলে রাখছি।'

গোবর্ধনের প্ল্যানটা হর্ষবর্ধনের ঠিক মনঃপূত হয় না। তিনি ঘাড় নেড়ে গম্ভীরভাবে বলেন,—উহুঁ!' খানিক পরে পুনরায় নিজের কথায় সায় দেন—'তা হয় না।'

কোন্‌টা হয় না, টাশ্‌কি চাপা কি কলা খাওয়া, গোবর্ধন দাদার মন্তব্য থেকে সেই দুরুহ তত্ত্ব উদ্ধারের প্রয়াস পাচ্ছে, এমন সময় একজন অপরিচিত লোক এসে উভয়কে অভিবাদন করল। 'খবর-কাগজ দেব বাবু?' লোকটা কাগজওয়ালা।

'কাগজে কী হবে আর?' হর্ষবর্ধন চিন্তা করে বলেন, 'চুলছাঁটা তো হয়েই গেছে।'

গোবর্ধন বলে,—'শালুনে চুল ছাঁটতে গেলে তো কাগজের দরকার হয় না, ওরা কাপড় মুড়ে দেয়।'

'খবর-কাগজ থাকলে কে যেত ঐ হতভাগার শালুনে? ওর চেয়ে কাগজে মাথা গলিয়ে উবু হয়ে হয়ে বসে ঘরোয়া নাপিতের কাছে ছাঁটানো ঢের ভাল! হ্যাঁ, ঢের ভাল!' এই বলে হর্ষবধূন হকারের দিকে ঝোঁক দেন,—'তা বাপু, একটু যদি আগে আসতে—নেওয়া যেত তোমার একখান কাগজ। গোবরা ছাঁটবি নাকি, নেব কাগজ?'

'এসেছে যখন আশা করে—কেন একখানা।'

কাগজওয়ালা সেদিনকার একখানা বাঙলা কাগজ হর্ষবর্ধনের হাতে দেয়। মুহূর্তমধ্যে তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যায়।

'এ কী কাগজ? এত ছোট কেন? এ তো আমাদের পুরোনো হিতবাদী নয়! না বাপু, আমাকে প্রকাণ্ড বড় একখানা দাও— হিতবাদীই দাও কিংবা হিতবাদীর মতন। আজকের হোক, পুরোনো হোক তাতে ক্ষতি নেই। টুকরো-টাকরা এতগুলি আমার কী কাজে লাগবে? মাথা গললেও গা ঢাকা তো পড়বে না এতে?'

'পেতে বসা যাবে অন্তত!' গোবরা আর-একটা সম্ভাবনার সদ্ব্যবহারের দিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—'যদি টেবিলগুলোয় ছারপোকা থাকে দাদা?'

'হ্যাঁ, তবে দাও তোমার কাগজ।' হর্ষবর্ধন ঠন্ করে একটা টাকা ফেলে দেন।

'কোন্ কোন্ কাগজ দেব বাবু?' হকার সপ্রশ্ন হয়।

'যা' যা' আছে দাও না কেন তোমার। এক টাকার মধ্যে কিন্তু—ওর বেশি কিনতে পারব না এখন।' লোকটার বিস্ময়বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠবার আগেই আবার তাকে কাবু করে দেন—'কি কাগজ দিচ্ছিলে তুমি—তাই না-হয় দাও এক টাকার । ঘর তো একখান নয়, টেবিল চেয়ারও অনেক।'

গোবর্ধন যোগ করে,—'আর যদি থেকে থাকে তাহ'লে ছারপোকাও অঢেল হবে।'

হকার তার বগলের সমস্ত কাগজ গুণতে থাকে, হর্ষবর্ধন তার থেকে একখানা টেনে নিয়ে ভাইয়ের হাতে দেন,—'কী কাগজ পড়ে দ্যাখ্তো গোবরা! হিতবাদী যে নয় তা আমি না-পড়েই বলতে পারি। তবে হ্যাঁ, হিতবাদীর বাচ্চা হতে পারে।'

'হ্যাঁ, বাচ্চা হাতি—বাচ্চা হিতবাদীর মতই দেখতে দাদা!' গোবর্ধন নামটা পড়বার চেষ্টা করে,—'বলছে, আনন্দবাজার পত্রিকা।'

'ঠিক হয়েছে। কলকাতার হাট-বাজারের সব খবর রয়েছে এতে। সবাই তো কলকাতায় আমাদের মত বেড়াতে আর টাকা ওড়াতে আসে না, হাট-বাজার কেনা-কাটা করতেই অনেকের আসা হয়। তাদের সুবিধের জন্যেই এই কাগজ,—বুঝতে পেরেছিস গোবরা?'

'যাতে লোকে, মানে যারা পাড়াগেঁয়ে, অনর্থক না ঠকে যায়—বেশ আনন্দের সঙ্গে বাজার করতে পারে। অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছি আমি।'

'হ্যাঁ, তা বুঝবিই তো! বলে দিলুম কিনা!' হর্ষবর্ধন গোবরার ওপর-চালে ঠিক আপ্যায়িত হতে পারেন না,—'এইজন্যেই তোকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না!'

এই বলে তিনি ভাইয়ের প্রতি আর দৃকপাত না করে হকারের বিষয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন,—'হ্যাঁ হে বাপু, তোমার কাছে 'জগুবাবুর বাজার' বলে কোন কাগজ আছে? নেই? কাছে না থাক একটু পরে এনে দিতে পারবে তো? পুরোনো হলেও চলবে, পুরোনো খবরও পড়া যায়,—খবর থাকলেই হল, খবর পড়া নিয়ে কথা। আজকের খবর আজকেই পড়তে হবে তার কোন মানে নেই। ঐ আমাদের বাড়ি, ওখানে গিয়ে দিয়ে এলেই হবে; অ্যাঁ? কি বলছ? ও নামে কোন কাগজই নেই? একদম নেই? উহুঁ—অসম্ভব! এ কখনও হতে পারে? জগুবাবুর বাজার যখন আছে তখন কাগজও নিশ্চয় আছে ওখানকার—না, জগুবাবুর বাজারই নেই তুমি বলতে চাও? বাজার আছে? বাজার আছে তো কাগজ নেই কেন হে! আশ্চর্য! থাকলে ভাল হত। সেই কর্মচারীটা জগুবাবুর বাজারের কাছে কাল নাইস হোটেলের কথা বলেছিল, তার সমস্ত খবর বিশদে জানা যেত তাহলে।'

হকারটা ঘাড় নেড়ে জবাব দিচ্ছিল, এতক্ষণে কথা বলার ফুরসুৎ পেল—'সাড়ে দশ আনার কেবল হল বাবু! আর সাড়ে পাঁচ আনার আনন্দবাজার আমি একটু পরেই দিয়ে আসব আপনার ওই বাসায়—দিয়ে যাব ঠিক, ঘাবড়াবেন না।'

হর্ষবর্ধন কাগজের তাড়না গোবরার কাঁধে চাপিয়ে দেন, দিয়ে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে বিনা বাক্যব্যয়ে অবলীলায় বাড়ির অভিমুখে রওনা হন। তখনকার মত ভাইয়ের প্রতি তাঁর আর চিত্ত নেই। তাঁর মনের মধ্যে গজগজ হতে থাকে, 'আমি বললাম বলে তাই জানল, আর বলে কিনা জানি, অনেক আগেই জানতাম! কী ভয়ানক মিথ্যেবাদী দেখেছ! ইস, এমন জানোয়ার নিয়ে মানুষ কলকাতায় আসে!'

তাড়া-স্কন্ধে গোবর্ধন দাদার অনুসরণ করে—সেও কোন কথা বলে না। কোন্‌খানে যে তার দোষ হল যে-অপরাধে দাদা চটে গেলেন, তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে অনেক আন্দোলিত করেও সে তার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে না। তার অন্তঃকরণেও ফোঁস-ফোঁসানি শুরু হয়,—'তা যাবে তো যাও না বাপু কলার খোসা চেপে! আমি কি বারণ করেছি, না, বাধা দিচ্ছি? মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, আর তোমার দৌড় ঐ ধড়াম্‌তলা! ঐখানে পৌঁছেছ কি অমনি

আর-একটি ধড়াম্! ব্যাস! ধড় এবার আস্ত থাকলে হয়! ধড় তো নয়, যেন ভুধর!'

বাড়ির ভেতরে গিয়েও রফার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কেউ কারু সঙ্গে কথা বলে না, নিঃশব্দে যত টেবিল চেয়ারের উপর কাগজ পেতে চলে। সমস্ত ঘর নিঃশেষ করে বসবার কামরায় এসে দেখে ডেণ্টিস্টের সম্পর্কিত দাড়ি-ইচ্ছুক সেই ছেলেটি চেয়ারের একখানা কাগজ অপসারিত করে একমনে পড়ে চলেছে।

দাঁত তুলবার জন্যে বোধহয় ডাকতে এসেছে—গোবরার এইরকম আশঙ্কা হয়, সে ভ্রুকুটি-কুটিল নেত্রে তাকিয়ে থাকে। হর্ষবর্ধন স্মিতমুখে ওকে অভ্যর্থনা করেন,—'কী কদ্ধুর এগুলো তোমার দাড়ি?'

ছেলেটি অপ্রতিভের মত একটু হাসে,—'আজকের কাগজটা একবার দেখতে এলাম। গোরা বলছিল,—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না—কে একজন পৃথ্বীশ রায় নাকি অমনি-অমনি উড়োজাহাজে করে ইটালি বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। তা দেখছি সত্যিই বটে!'

'উড়োজাহাজ করে! অ্যাঁ—তাই বললে না তুমি? হর্ষবর্ধন অবাক হয়ে যান—'জাহাজ আজকাল উড়ছে নাকি?'

'তুই থাম্! তুই তো সব জানতিস!' গোবর্ধনকে ধমক দিয়ে হর্ষবর্ধন ছেলেটির অভিমতের অপেক্ষা করেন,—'খবর-কাগজে লিখেছে? ছাপার অক্ষরে? কই দেখি! যখন ছেপে দিয়েছে তখন সত্যিই হবে।'

তিনজনেই একসঙ্গে কাগজের উপর হুমড়ি.খেয়ে পড়ে এবং তিন-জোড়া বিস্মিত দৃষ্টি একত্র হয়। হ্যাঁ, সত্যিই বটে! স্পষ্ট অক্ষরেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যে আটাশ বছর থেকে আটাশি বছরের মধ্যে যাদের বয়স এমন দু'-জন দুঃসাহসী সহযাত্রী চেয়েছেন পৃথ্বীশ রায়। তাঁদের তিনি ইটালি নিয়ে যাবেন, আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন—ইত্যাদি, এইরকম অনেক কিছুই লেখা রয়েছে সেই কাগজে।

'প্রায় মাসখানেক থেকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, গোরা অনেক আগেই আমায় বলেছিল। কিন্তু আমাকে কি নিয়ে যাবে?' ছেলেটি হর্ষবর্ধনের সম্মতির অপেক্ষা করে,—'আমাকে কি আটাশ বছরের মত দেখতে? ঠিক বলুন তো? ভালো করে তাকিয়ে বলুন।'

হর্ষবর্ধন দারুণ ঘাড় নাড়েন,—'মোটেই না। একদম না, বরং আট বছরের মতই অনেকটা। আমাদের আসামের অনেক আট বছরের ছেলে তোমার মত দেখতে হয়।'

'সেইজন্যেই তো মাসখানেক থেকে, মানে যেদিন গোরার কাছে শুনেছি সেদিন থেকেই দাড়ি কামাতে লেগেছি। কিন্তু কই, এতদিনেও দাড়ি বেরুল না তো!' হতাশভাবে বার-দুয়েক সে গলে হাত বুলোয়—'দাড়ি বেরুলেও না-হয় আটাশ বলে নিজেকে চালাতে পারতাম কিংবা যদি আগে থেকে আসামে জন্মাতাম তাহলেও হতে পারত হয়ত। আপনি বললেন না যে আট বছরের ছেলেও সেখানে প্রায় ডবল হয় দেখতে—'

গোবর্ধন বলে,—'নিশ্চয়! আবার আট বছরেই অনেকের গোঁফ দাড়ি বেরিয়ে যায়।'

আসামী বালকের সৌভাগ্যে ছেলেটি ঈর্ষান্বিত হয়,—'তাহলে এমনিতেই তো আমি আটাশ বছরের মত দেখতে হতুম! আর দাড়িও হত সেইসঙ্গে! মায় গোঁফ পর্যন্ত বেরিয়ে যেত আমার। তাহলে ইটালি যাবার তবে বাধা ছিল কি!'

হর্ষবর্ধন বলেন,—'কিছু না।'

'মাসখানেকের জন্যে আসামে চেঞ্জে গেলেও তো হয়! হয় না?'

'হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে খুব কষে আসামী দুধ ঘি খেলেও তোমার চেহারা ডবল হয়ে যাবে এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি। তবে ঐ দাড়ির কথাটা—'

গোবর্ধন দাদার বাক্য সমাপ্ত করে দেয়,—'দাড়ি গজায় জলবায়ু গুণে। চীন দেশে যে একেবারেই হয় না, তার কী করছি বল? এ তো মিথ্যে কথা নয়, নিজের চোখে দেখলাম কাল সকালে।'

'আচ্ছা, আমি যদি আসামে গিয়ে দাড়িতে জলপটি লাগিয়ে রাখি আর দিনরাত পাখার বাতাস করি তাহলেও কি এক মাসে আমার দাড়ি গজাবে না?'সে গোবর্ধনকে জিজ্ঞাসা করে এবার।—'হবে না দাড়ি?'

'হবে না? আলবৎ হবে! হতেই হবে দাড়িকে—জল হাওয়ার গুণ তবে কী?' গোবর্ধন সজোরে জবাব দেয়।

'তবে তাই যাই, বাবাকে বলে কয়ে দেখি গে। আসামে যেতে হলে বাবার পারমিশন নিতে হবে। আপনাদের সঙ্গে যদি যেতে দেয় তো হয়।' ছেলেটি চলে যায়।

'ইটালি কোথায় দাদা?' গোবর্ধন ভয়ে-ভয়ে দাদাকে জিজ্ঞেস করে।

'কোথায় আবার! বিলেতে।' হর্ষবর্ধনের বিরক্তি তখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে।

'বিলেত আর ইটালি কি এক জায়গা নাকি?'

'নিশ্চয়! খাপরার ইংরিজি যেমন টালি, বিলেতের ইংরিজি তেমনি ইটালি।'

'এইবার বুঝেছি।' গোবর্ধন মাথা নাড়ে,—'নেপালের ইংরিজি যেমন ভুটানি।'

হর্ষবর্ধন কিঞ্চিৎ প্রীত হন,—'কিন্তু সে কথা তো নয়, আমি ভাবছি কি—'

গোবর্ধন দুর্ভাবিত দাদার দুশ্চিন্তার অংশ নেবার ব্যগ্রতা ব্যক্ত করে,—'বল না দাদা কী ভাবছ তুমি?'

'ভাবছি যে আমাদের বয়স কিন্তু আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে।'

গোবর্ধন তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে—তার বুদ্ধির সমস্ত দরজা-জানলা যেন একযোগে অকস্মাৎ খুলে যায়,—'হ্যাঁ! ভারি চমৎকার হয় দাদা! এই জন্যেই তো তোমাকে দাদা বলি! তোমায় গড় করি এইজন্যই।' তারপর একটু দম নেয়,'তাহলে উড়োজাহাজেও চড়া হয়—জাহাজেই চাপিনি তো উড়োজাহাজ!'

'তুই আছিস কেবল চাপবার তালে! আমাকে কত দিক ভাবতে হয়! ছেলেমানুষ সঙ্গে নিয়ে বিদেশে এসেছি, তার উপরে বিদেশ থেকে আরো বিদেশে—। আটাশ হলে কি হয়, তুই ওই ছোঁড়াটার চেয়েও অপোগণ্ড! উড়োজাহাজ উলটে গিয়ে যদি আকাশ থেকে ঝপাৎ করে পড়ে যাস তখন কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে তোমাকে? হাওয়ার চোটে কোন্ মুলুকে কোথায় যে উড়ে যাবি কে জানে! অত উঁচু আকাশে হাওয়ার জোর কি কম!'

'পড়ব কেন? আমি তোমাকে ধরে থাকব দেখো।'

'হ্যাঁ, তাহলে হয়। আমি বেশ ভারি আছি, সহজে আমাকে ওলটাতে পারবে না।'

'তবে আর ইটালী যেতে বাধা কী আমাদের? বয়েস তো আছেই, তাছাড়া দাড়িও রয়েছে—উড়োজাহাজে চাপতে হলে যা যা চাই।'

'আমি তাই ভাবছিলুম। এ-দুদিন কলকাতা তো বহুৎ দেখলাম, এখন বিলেতটা একটু দেখে আসা যাক বরং।' হর্ষবর্ধন মাথা চালেন,—'বিলেতের হালচাল আবার কী করম কে জানে!'

'হ্যাঁ, উড়োজাহাজে চাপতে পারলে মোটরে না চাপলেও চলে যায়, তত দুঃখ থাকে না আর। তবে চল দাদা, বিজ্ঞাপনের ঠিকানাটা কারু কাছে বাৎলে

নিয়ে এক্ষুণি আমরা বেরিয়ে পড়ি। নইলে অন্য সকলে আমাদের আগে গিয়ে ভিড় জমিয়ে ফেলবে। দেশে দাড়িওলার তো আর অভাব নেই!'

'আচ্ছা আমরা যে ইটালি যাব, সেই কথাই যে আমি ভাবছিলাম তা কি তুই জানতে পেরেছিলি?' হর্ষবর্ধন মুরুব্বির মত একখানা চাল দেন।

'একদম না।' সরল গোবর্ধন সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়।

'আমি কিন্তু জানতে পেরেছিলাম। খবর-কাগজ পড়ে নয়, যেদিন বাড়ি থেকে পা বাড়িয়েছি তখনই জেনেছিলাম আমাদের ইটালি যেতে হবে। জানিস?'

গোবর্ধনের সংশয় হয়, প্রায় প্রতিবাদ করে বসে আর কি, কিন্তু উড়োজাহাজে চাপবার লোভে চেপে যায় সে। গোঁফে চাড়া দেন হর্ষবর্ধন,— 'তোর চেয়ে কত বেশি জানি আমি, দ্যাখ্!'

গোবর্ধন মৌন সম্মতি জানায়, তখন দুই ভাইয়ের মধ্যে আবার প্রবল ভাবের সূত্রপাত হয়।

দশম ধাক্কা
হর্ষবর্ধনের সমুদ্র-লঙ্ঘন

বিখ্যাত বিমানবীর পৃথ্বীশ রায়ের নাম শুনেছ নিশ্চয়। তাঁর খেয়াল হয়েছে, নিজের মনো-প্লেনে ইটালি যাবেন—একেবারে ননস্টপ ফ্লাইট, কলকাতা থেকে ইটালি এবং ইটালি থেকে ফিরে ফের কলকাতা।

বাঙালীদের মুখোজ্জ্বল করতে যাচ্ছেন তিনি, কিন্তু তাঁর নিজের মুখ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল না সকাল থেকে। দু'জন সহযাত্রী চেয়ে খবরের কাগজে তিনি ইস্তাহার দিয়েছিলেন, তার পনের ষোল হাজার জবাব এসেছে কিন্তু প্রায় সবই পনের ষোল বছরের ছেলেদের কাছ থেকে।

না, সেরূপ কোনো অবদানের আবেদন নেই।

তিনি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে প্রাণহানির কোন আশঙ্কা নেই, আর যদিই বা এরোপ্লেন বিকল হয় তখন প্যারাসুট রয়েছে। কিন্তু বয়স্ক বাঙালীরা প্রাণরক্ষার প্রলোভনে সহজে পড়তে রাজি নয় স্পষ্টই তা বোঝা যাচ্ছে। অনেক ইস্কুলের মেয়েও যেতে চেয়েছে, আট বছরের ছেলেদের কাছ থেকেও অনুরোধ এসেছে কিন্তু আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে একজনও না।

পৃথ্বীশ রায় খামের পর খাম খুলছেন আর ঘাড় নাড়ছেন—হ্যাঁ, এইসব ছেলেমেয়েরা যেদিন বড় হবে সেদিন আমাদের দেশও বড় হবে, কিন্তু ততদিন—! নাঃ, আটাশ বছর কি আটাশি বছর আর অপেক্ষা করবার মতো সময় আমার হাতে নেই। সহযাত্রী বা না-সহযাত্রী, আজই আমাকে যাত্রা করতে হবে।'

একটি ছেলে লিখেছে,—'দেখুন, আমি আপনার সাথী হতে রাজি আছি, কিন্তু একটা শর্তে! আপনাকে এক সময়ে এরোপ্লেন বিকল করতে হবে, যেমন বায়োস্কোপে দেখা যায় তেমন হলেও চলবে; এরোপ্লেনে আগুন

লাগিয়েও দিতে পারেন, তাতেও আমার বিশেষ আপত্তি নেই। কেবল আমাকে প্যারাসুটে নামবার সুযোগটা দিতে হবে। অজানা দেশে অচেনা লোকেদের মধ্যে হঠাৎ আকাশ থেকে নামতে ভারি মজা হয় কিন্তু—!'

আর একটা চিঠির বক্তব্য,—'আমাকে কি আপনি সঙ্গে নেবেন? আমার একটা মুস্কিল আছে। আমার বয়স আটাশ বছর কিন্তু দেখতে ভারি ছোট দেখায়। দেখলে আপনার মনে হবে বারো কি চোদ্দ—এই হয়েছে গন্ডগোল। এইজন্যে আমাকে ইস্কুলেও খুব নিচু কেলাসে ভর্তি করে দিয়েছে। কিন্তু আমি সত্যি-সত্যি বলছি আমার আটাশ বছর বয়স—সবে আটাশ পেরোলাম সেদিন। আপনি না হয় আমাদের পাড়ার টুনুকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

এই দুটি আবেদন সম্পর্কে গুরুতর বিবেচনা করছেন, এমন সময়ে দুটি ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। পৃথ্বীশ রায় মুখ তুলে চাইলেন,—'কে আপনারা?'

এক নম্বর ভদ্রলোক দু-নম্বরকে দেখিয়ে বললেন,—'উনি হচ্ছেন হর্ষবর্ধন। আমার দাদা।'

দু-নম্বর বললেন,—'আর ওর নাম গোবরা।'

এক নম্বর সংশোধন করে দিলো,—'উহুঁ। শ্রীমান গোবর্ধন।'

পৃথ্বীশ রায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হন,—'তা, কী চাই আপনাদের?'

হর্ষবর্ধন বলেন,—'আমরা আপনার সঙ্গে একটু ঘুরে আসতে চাই।'

গোবর্ধন আবার সংশোধন করে,—'উহু!! উড়ে আসতে।'

'ওঃ, উড়োজাহাজে ইটালি যাবেন? বেশ তো, বেশ তো! তা আপনাদের বয়েস?'

হর্ষবর্ধন ভাল করে গোঁফ চুমরে নেন,—'আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে।'

গোবর্ধনও প্রয়োজন-মত গম্ভীর গলায় সায় দেয়,—'হুঁ, তার থেকে এক দিনও কম নয়।'

এর পর আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না; পৃথ্বীশ রায় বলেন,—'তবে কাল সকাল দশটার সময় হাজির থাকবেন দমদমে। দমদম এরোড্রোম, বুঝলেন?'

হর্ষবর্ধন ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করেন,—'তা, ভাড়া কত পড়বে? খুব বেশি নয় তো?'

গোবর্ধন বলে,—'দশ হাজার পর্যন্ত আমরা উঠতে পারি। বেশি টাকা তো সঙ্গে আনা হয়নি!'

'হ্যাঁ, আসাম থেকে কলকাতায় এসেছি বেড়াতে বিলেত যাওয়ার মতলব ছিল না তো আগে! তা, আপনি যখন খবরের কাগজে ছাপিয়েছেন যে তিন দিনে বিলেত ঘুরিয়ে আনবেন—'

গোবর্ধন মাঝখানে বাধা দেয়,—'উড়িয়ে আনবেন।'

'হ্যাঁ, বিলেত উড়িয়ে আনবেন, তখন আমরা ভাবলাম, মন্দ কী? এই ফাঁকে বিলেত ঘুরে—ওর নাম কি—বিলেত উড়ে আসা যাক না!'

পৃথ্বীশ রায় বলেন,—আপনাদের সহযাত্রী পাচ্ছি এই আমার সৌভাগ্য! এক পয়সাও লাগবে না আপনাদের।'

গোবর্ধনের চোখ কপালে ওঠে,—'অ্যাঁ, বলে কী দাদা! বিনে পয়সায় বিলেত!'

হর্ষবর্ধনও কম অবাক হন না,—'ওমনি-ওমনি নিয়ে যাবেন?'

'নিয়ে যাব আবার নিয়ে আসব—একদম মুফৎ! বরং আপনারা দাবি করলে কিছু ধরে দিতে রাজি আছি এর ওপরে।'

হর্ষবর্ধনের বিস্ময়ের সীমা থাকে না,—'না, আমরা কিছুই চাই না। আমরা তো রোজগার করতে কলকাতায় আসিনি, টাকা ওড়াতেই এসেছি।'

'কিন্তু দেখছ তো দাদা, টাকা ওড়ানো কত শক্ত এখানে!' গোবর্ধন যোগ করে,—'আমি তখনই বলেছিলাম তোমায়!'

হর্ষবর্ধন পিছপা হবার পাত্র নন, 'তা বেশ, বিনে পয়সায়ই সই, ওমনিই যাব বিলেত। তার কী হয়েছে?'

পৃথ্বীশ রায় বলেন,—'একটু ভুল করছেন বিলেত নয়, ইটালি।'

'ওই যাকে বলে ভাজা চাল তারই নাম মুড়ি। বিলেত আর ইটালি একই কথা। সমুদ্দুর পেরুলেই বিলেত, তা ইটিলিই কি আর আন্দামানই কি?'

গোবর্ধন অমায়িকভাবে বসাতে থাকে,—'ও আর আমাদের বোঝাতে হবে না।'

পৃথ্বীশ রায় বলতে শুরু করলে,—'দেখুন, যদিও উড়োজাহাজে প্রাণহানির কোন ভয় নেই, তবু—'

হর্ষবর্ধন বাধা দেন,—'আমরা জানি। আকাশে আবার ভয় কিসের? এ তো রেলগাড়ি নয় যে কলিশন হবে! আর আকাশে এন্‌তার ফাঁকা, কোথায় কার সাথে বা ধাক্কা লাগবে বলুন! তুই কী বলিস রে গোবরা?'

গোবরা জবাব দেয়,—'তুমিই বল না, কোন পাখিকে কি কখনো মরতে দেখা গেছে? মানে খাঁচার পাখি নয়, আকাশের পাখিকে? আকাশে যারা ওড়ে তাদের মরণ নেই দাদা! আর উড়োজাহাজ তো বলতে গেলে পাখির সগোত্রই। এখুনি পথে আসতে আসতে দেখলে না—ইয়া বড়-বড় দুই পাখা!'

পৃথ্বীশ রায় তথাপি বোঝাতে চেষ্টা করেন,—'তা বটে, পাখা থাকলেই পাখি হয় বটে, কিন্তু, আরশোলা আর এরোপ্লেন বাদ। কিন্তু আমার কথা তো তা নয়! প্রাণহানির ভয় নেই সে কথা সত্যি, তবু আমি বলছিলাম কি, আপনাদের কি লাইফ ইন্‌শিওর করা আছে? নেই? তা, একটা করে ফেলুন না কেন যাত্রার আগে, বলা যায় না তো! যদিই একটা বিপদ আপদ ঘটে যায়, একটা প্রিমিয়াম দেয়া থাকলে আত্মীয়-পরিবার তখন টাকাটা পাবে।'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন,—'হ্যাঁ, লাইফ ইন্‌শিওর জানি বই-কি! আসামের জঙ্গলেও ওরা গেছে। তা আপনি যখন বলছেন, পঞ্চাশ হাজার কি লাখ

খানেকের একটা করে ফেলা যাক। তবে আমার নামেই করুন, ওর নামে করে কাজ নেই—ও কখনো মরবে না। আমি ম'লে টাকাটা যেন গোবরাই পায়। হ্যাঁ, যা বলেছেন, যদিই দৈবাৎ উড়ো কল বেগড়ায়, বলা যায় না তো! পড়লেই তো সব চুরমার—হাড়গোড় একদম ছাতু! তখন কি আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে!'

পৃথ্বীশ রায় জিজ্ঞাসা করেন—'ওঃ, উনি আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন না তাহলে?'

'নিশ্চয়ই যাচ্ছে! যাচ্ছে না কে বললে? ওকে ছেড়ে আমি যমের বাড়ি যেতেও রাজি নই', হর্ষবর্ধন জোরালো গলায় জবাব দেন,—'বিলেত তো বিলেত!'

পৃথ্বীশ রায়ের উড়োজাহাজ ইটালির এরোড্রোমে পৌঁছতেই সেখানকার প্রবাসী বাঙালীরা ভিড় করে এল। অভিবাদন ও অভিনন্দনের পালা সাঙ্গ হলে হর্ষবর্ধন সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন,—'দেখছিস গোবরা, বাংলা ভাষাটা কী রকম ছড়িয়ে পড়েছে আজকাল!'

'হুঁ দাদা, নইলে বিলিতি সাহেবদের মুখে বাংলা বুলি!'

পৃথ্বীশ রায় বুঝিয়ে দেন যে সমাগত ভদ্রলোকদের সাহেবি পোশাক হলেও আসলে তাঁরা বাঙালী, ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা পড়াশুনোর ব্যাপারেই এঁদের এই বিদেশে বাস; বাঙালী বলেই বাঙালীদের সম্বর্ধনা করতেই সবাই এসেছেন। তখন দুই ভাই দস্তুরমত অবাক হয়ে যায়। 'বটে? বুঝেছি তাহ'লে, কাঠের কারবার নিয়েই এদের এখানে থাকা!' হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়তে থাকেন।

'তা আর বলতে!' গোবর্ধন যোগদান করে,—'কাঠের জন্যে আসামের জঙ্গলে গিয়ে মানুষ বাস করে, তা বিলেতে আসবে যে আর বেশি কী!'

পৃথ্বীশ রায় জানান যে সন্ধ্যার মুখেই ওঁরা দেশমুখো হবেন; এঞ্জিনের অবস্থা ভাল নয়, এইজন্যে সারাটা দিন ওঁর কল মেরামত করতেই যাবে। হর্ষবর্ধন বলেন,—'তাহ'লে এই ফাঁকে এই বিলিতি শহরটা দেখে নেওয়া যাক না কেন?'

গোবর্ধন সায় দেয়,—'হুঁ, পুরো একটা দিন পাওয়া যাচ্ছে যখন!'

মুকুল ব'লে একটি বছর পনের ষোলর ছেলে এগিয়ে আসে,—'আসুন, এখানে যা যা দেখবার আছে আপনাদের সব দেখাব আমি।'

হর্ষবর্ধন অবাক হন,—'অ্যাঁ, এইটুকুন ছেলে তুমিও কাঠের কারবারে লেগেছ? এই বয়সেই?'

মুকুল বলে, 'না, আমার বাবা ডাক্তার।'

গোবর্ধন ব্যাখ্যা করে,—'তার মানে, তিনি তোমাকে ব্যবসাতে সাহায্য করেন। মরলেই তো কাঠের খরচ!'

হর্ষবর্ধন সুলকিত হয়ে ওঠেন,—বাপ ডাক্তার, ছেলের কাঠের কারবার; এর চেয়ে আর লাভের কী আছে? ব্যবসার দুটো দিকই একচেটে—ডবল লাভ! আমার ছেলেকে আমি ডাক্তারি পড়াব। আর নাতিকে দেব আমাদের কারবারে, বুঝলি গোবরা?'

পৃথ্বীশ রায় মনে করিয়ে দেন,—'আপনারা সন্ধ্যার আগেই ফিরবেন কিন্তু।'

'সে আর ব'লে দিতে হবে না। আপনি আমাদের ফেলে চলে গেলেই তো হয়েছে! সব অন্ধকার! এখান থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরা আমাদের কম্ম নয়!'

গোবর্ধন মিনতি জানায়,—'দোহাই, তা যেন যাবেন না! দেখছেন তো, দাদা যা মোটা, একটু হাঁটলেই ওঁর হাঁপ ধরে। আমি হাঁটতে পারলেও দাদা পারবে না।'

হর্ষবর্ধনের আত্মসম্মানে ঘা লাগে,—হুঁ! দাদা পারবে না! নিশ্চয় পারবে, আলবৎ পারবে, দাদার ঘাড় পারবে! হেঁটে দেখিয়ে দেব?' গোঁফে তা' দিতে দিতে সদর্পে তিনি অগ্রসর হন।

'আসুন আপনারা আমার মোটরে।' হর্ষবর্ধনের অভিযানে মুকুল বাধা দেয়,—'ঐ যে আমার বেবি কার ঐখানে, আমি নিজেই ড্রাইভ করি।'

কিন্তু হর্ষবর্ধন থামেন না, তাঁর অগ্রগতি ততক্ষণে শুরু হয়েছে। গোবর্ধন সভয়ে দাদার বিরাট পদক্ষেপ দেখতে থাকে, তার আশঙ্কা হয়, হয়ত একেবারে আসাম না গিয়ে দাদা শান্ত হবেন না। কিন্তু সন্দেহ অমূলক, হর্ষবর্ধন সটান গিয়ে মোটরে পৌঁছেই গ্যাট হয়ে বসেন।

তখন আশ্বস্ত হৃদয়ে গোবর্ধনও দাদার অনুসরণ করে। কিন্তু হর্ষবর্ধন ভায়ের দিকে দৃকপাত করেন না, তিনি ভয়ানক চ'টে গেছেন, তিনি নাকি ভয়ানক মোটা, হাঁটতে গেলে তাঁর হাঁপ ধ'রে যায়—দেশে হ'লেও ক্ষতি ছিল না কিন্তু বিলেতে এসে তাঁকে এমনধারা অপমান, যতো বাঙ্গালী সাহেবদের সামনে, ছি! ছি! তিনি জোরে জোরে গোঁফে তা' দিতে থাকেন।

মুকুল ওঁদের মিউজিয়মে নিয়ে যায়, সেখান থেকে চিত্রশালায়। 'এই যে সব চমৎকার চমৎকার ছবি দেখছেন, এসব হচ্ছে মাইকের এঞ্জেলোর। পৃথিবীর একজন নামজাদা বড় আর্টিস্ট।'

'অ্যাঁ, বল কী? আমাদের মাইকেল? বিলেতে এসে ছবি আঁকত সে? বটে?' হর্ষবর্ধনের বিস্ময় ধরে না!

'মাইকেল এঞ্জেলোকে আপনারা জানলেন কী করে?'

'মাইকেলকে জানি না! তুমি অবাক করলে! তুমি তাঁর মেঘনাদবধ পড়নি?'

মুকুল ঘাড় নাড়ে,—'না তো! আমি জন্ম থেকেই এখানে কিনা, দেশে তো যাইনি কখনো!'

'বল্ না গোবরা, বল্না সেইটে মুখস্থ—সম্মুখ সমরে পড়ি চূড়বীরামণি, বহু বীর—বহু বীর—হুঁ, মনে পড়েছে, বীর বহু চলি যবে গেলা যমপুরে—তার পরে—তার পরে?'

গোবর্ধনও সহজে দমবার নয়,—হুঁরুরে হুরুরে হুরুরে করি গর্হিল ইংরাজ, নবাবের সৈন্যগণ ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ—'

হর্ষবর্ধন বিরক্ত হ'য়ে বাধা দেন,—"উহুঁ, উহুঁ! ও যেন মিলে গেল! মাইকেলের মেলে না। তোর কিচ্ছু মনে থাকে না, তুই একটা অপদার্থ! একেবারে রাবিশ! আবার আমাকে বলিস হাঁটতে পারে না!"

এতক্ষণে প্রতিশোধ নিতে পেরে হর্ষবর্ধন একটু খুশি হন, মুকুলকে সম্বোধন করেন,—'তুমি মাইকেল পড়নি তো? পড়ে দেখো, অনেক বই আছে মাইকেলের।'

গোবর্ধন বলে,—'পড়লে বোঝা যায় বটে, কিন্তু পড়া চাট্টিখানি নয়। দস্তরমতন শক্ত। দাঁতভাঙা ব্যাপার!'

হর্ষবর্ধন খাপ্পা হয়ে ওঠেন,—'পড়লে বোঝা যায়? তুই তো সব জানিস মাইকেলের! বল্ দেখি "হস্তী নিনাদিল"—এর মানে কী?'

বার-বার অপমানে গোবর্ধনও গরম হয়,—"তুমি বল দেখি?"

'আমি? আমি জানি না? আমি না জেনেই তোকে জিজ্ঞেস করছি বুঝি?' হর্ষবর্ধন গোঁফ পাকানো ছেড়ে আমতা আমতা করেন,—'এমন কী শক্ত মানেটা শুনি? "হস্তী নিনাদিল"? এ তো জলের মত সোজা! "নিনাদিল"র "নি" বাদ দিলেই টের পাবি। কিংবা "হস্তিনী নাদিল" তাও করা যায়।' গোবর্ধন তাঁর পাণ্ডিতো কাবু হয়ে পড়েছে দেখে পুনরায় তিনি গোঁফে হস্তক্ষেপ করেন,—হুঁঃ, এই তো তোর বিদ্যে! তবু "হ্রেষাধ্বনি" এখনো তোকে জিজ্ঞাসাই করিনি!'

গোবর্ধন এবার ভীত হয়, 'হ্রেষাধ্বনি' চাপা দেবার জন্যে বলে,—'মাইকেলের ছবিগুলো কিন্তু বেশ, না দাদা?'

'বেশ না ছাই, এর চেয়ে ওর পদ্য ঢের ভাল!'

মুকুল ওদের আরও অনেক কিছু দেখায়, মাইকের এঞ্জেলোর গড়া মূর্তি, মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্য, মাইকেল এঞ্জেলোর ফ্রেস্‌কো, এবং আরও কত কি কারুকার্য! মাইকেল এই বিদেশে এসে এত কাণ্ড করে গেছে ভেবে দু-ভাই কম অবাক হয় না! বলতে গেলে গোটা ইটালিটাই গড়ে পিটে গেছে সেই মাইকেল।

হর্ষবর্ধন মাইকেল-গর্বে গর্বিত হয়ে ওঠেন,—'মাইকেলের বাড়ি কোথায় ছিল জানিস গোবরা?'

'শোরে কি খুলনায় যেন।'

'উহুঁঃ, আসামে। আমাদের আসামে। আসামী ছাড়া কেউ অত খাটতে পারে নাকি? কী রকম প্রাণ দিয়ে খেটেছে দ্যাখ!'

'হ্যাঁ, ঠিক যেন ফাঁসির আসামী!' গোবর্ধন আর দাদার প্রতিবাদ করে না। 'ফাঁসির আসামীর মত প্রাণ দিয়ে খাটতে পারে কেউ?'

মুকুল ওদের বিখ্যাত রোমান ফোরাম দেখায়; হর্ষবর্ধন প্রশ্ন করেন,—'এও আমাদের মাইকেলের তো?'

'না, তাঁর জন্মাবার হাজার বছরেরও আগের তৈরি।'

'ওঃ!' হর্ষবর্ধন কিঞ্চিৎ হতাশ হন।

অতি প্রাচীন কালের একটা প্রস্তর-স্তম্ভের কাছে এসে হর্ষবর্ধন আবার প্রশ্ন করেন,—'মাইকেলের?'

'এ তাঁর জন্মাবার দু' হাজার বছর আগেকার।'

হর্ষবর্ধন দমে যান, মুকুল তাঁকে একটা বিরাট প্রস্তর-মূর্তি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—'ওটা কার মূর্তি জানেন?'

হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ চোখে তাকান,—মাইকেলের বোধহয়?

'উহুঁ। ভাস্কো ডা গামা; নাম শোনেননি?'

'গামা, গামা—নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে যেন। খুব কুস্তি করে বেড়াত লোকটা না?'

'ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল এ কথা ইতিহাসে লেখা আছে, কিন্তু কুস্তিগির কথা তো পড়িনি কখনো!'

'ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল! তুমি অবাক করলে বাপু! এইমাত্র আমরা তো ভারতবর্ষ থেকেই আসছি, কিন্তু কই এ-রকম কথা তো শুনিনি! অত বড় দেশটা আবিষ্কার করল আর আমরা তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলাম না!'

গোবর্ধন বলে,—'তুমি ভুল পড়েছ, ভারতবর্ষ নয়, কুস্তি আবিষ্কার করেছিল গামা। আমি ভাল রকম জানি।'

'কি গামা বললে? ভাস্কো ডা গামা? বেশ নামটা। তা লোকটা কি মারা গেছে?'

'অনেক দিন! চারশো বচ্ছরেরও আগে!'

'চারশো বচ্ছর! বল কী হে! তা কিসে মারা গেল সে?'

'তা কী জানি!' মুকুল মাথা নাড়ে।

'বসন্ত বোধহয়?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসা করেন।

'বইয়ে তো পড়িনি, জানি না।' মুকুল আরও জোরে মাথা নাড়তে থাকে।

গোবর্ধন বলে,—'হামও হতে পারে!'

'হতে পারে—তাও হতে পারে—বেঁচে নেই যখন, কোন কিছুতে মারা গেছে নিশ্চয়।' মাথা নাড়তে নাড়তে মুকুলের ঘাড়ে ব্যথা হয়।

'বাপ মা আছে?'

'অসম্—ভব!' প্রশ্ন শুনে মুকুল আকাশ থেকে পড়ে। 'ছেলেপুলেই বেঁচে নেই তো বাপ মা!'

অবশেষে ওরা পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তুর সম্মুখীন হয়—মিশরের কোন এক রাজার মামি। মুকুল উৎসাহে লাফাতে থাকে, 'দেখছেন?—মামি! মামি।'

হর্ষবর্ধন কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে লক্ষ্য করেন,—'কী বললে? কী নাম ভদ্রলোকের?'

'নাম? ওর কোন নাম নেই—জিপ্‌সিয়ান মামি!'

'মাইকেলের মত কোন নামজাদা লোক বোধহয়? তা এই বিলেতেই কি এর জন্ম?'

'না—জিপ্‌সিয়ান মামি!'

'আমাদের বাংলাদেশের—মানে, আমাদের আসামের তবে?'

'না, না, বলছি তো, জিপ্‌সিয়ান!' মুকুল এবার ক্ষেপে যায়।

'ও, তাই বল! এতক্ষণে বুঝেছি। ইংরেজ!'

'না, ইংরেজ নয়, ফরাসী নয়, জার্মান নয়, ইটালির লোকও নয়, এমনকি বাঙালীও না—ইজিপ্টায় এর জন্ম।'

'ইজিপ্টায় জন্ম! ইজিপ্টা বলে কোন দেশের নাম তো কখনো শুনিনি!' হর্ষবর্ধন সন্দেহভরে মাথা নাড়েন।

'ইজিপ্টায়, না, ইজিচেয়ারে? তুমি ঠিক জান?' গোবর্ধন প্রশ্ন করে।

'ইজিপ্টা কোনো বিদেশ-টিদেশ হবে। গোবরা, তলায় কী লেখা রয়েছে পড়ে দ্যাখ তো!'

'এফ্-আর্-ও-এম্—ফ্রম্; ই, জি, ওয়াই, পি, টি। ফ্রম্—ফ্রম মানে হইতে আর ই-জি-ওয়াই-পি-টি?'

'এগ্‌ওয়াইপ্ট্। এগ্‌ওয়াইপ্ট্ হইতে। এগ্ মানে ডিম। অর্থাৎ যেখান থেকে আমাদের দেশে ডিম চালান যায় সেখানকার এই লোকটা। বোধহয় কোন ডিমের আড়ৎদার-টাড়ৎদার।'

'মামি—মামি!' গোবর্ধন প্রশ্ন করে,—'তা এর মামা কোথায় গো?'

মুকুলের ঘাড় টন্-টন্ করছিল, সে হাত নেড়ে জানায় যে ওর জানা নেই।

'দেখছিস গোবরা, কি রকম মজা করে শুয়ে আছে লোকটা—কেমন শান্তশিষ্ট মুখের ভাব!'

গোবর্ধন মুকুলের মুখে তাকায়,—'একি—অ্যাঁ—এ কি মারা গেছে নাকি?'

'নিশ্চয়! তিন হাজার বছর!'

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন—'অ্যাঁ, বল কি? তিনি হাজার বছর ধরে এমনি মরে পড়ে রয়েছে?'

গোবর্ধনের বিশ্বাস হয় না,—'তিন হাজার বছর! হতেই পারে না! তিন দিনে মানুষ পচে ওঠে, আর এ কিনা তিন হাজার—'

হর্ষবর্ধনের মুখ এবার অত্যন্ত গম্ভীর হয়,—'শোন ছোকরা, তুমি কী বলতে চাও কও দেখি? বাংলাদেশ থেকে এসেছি ব'লে কি আমাদের বাঙাল পেয়েছ? যা খুশি তাই বুঝিয়ে দিচ্ছ? ছেলেমানুষ ব'লে এতক্ষণ তোমাকে কিছু বলিনি; তা বিলেতের ছেলে ব'লে কি তোমাকে ভয় ক'রে চলতে হবে? অত ভীতু নই আমরা! তোমার চেয়ে আমাদের বাংলাদেশের ছেলেরা ঢের ঢের ভাল!'

গোবর্ধন দাদার সঙ্গে যোগ দেয়,—'হ্যাঁ, স্পষ্ট কথা! আমরা ভয় খাই না! নিশ্চয় ভাল, হাজার হাজার গুণ ভাল! অত বোকা পাও নি আমাদের, যে যা খুশি তাই বুঝিয়ে দেবে! তিন হাজার বছরের বাসি মড়া চালাতে চাও আমাদের কাছে? টাটকা মড়া থাকে তো নিয়ে এস—টাটকা চমৎকার খাসা একখানা লাশ! গোঁফ দাড়ি সমেত তোফা! আমাদের আপত্তি নেই।'

তিনজনকে বাক্যহীন গুরুগম্ভীর মুখে ফিরতে দেখে পৃথ্বীশ রায় বিস্মিত হন। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের আগেই হর্ষবর্ধনের বিচলিত কণ্ঠ শোনা যায়, 'মশাই, চলুন! আর নয়, এ দেশে আর এক মুহূর্ত না! এই আপনার বিলেত? দূর দূর! সারা শহরটায় দেখবার মত কিচ্ছু নেই! এর চেয়ে আমাদের কলকাতা ভালো! ঢের ঢের ভাল! হ্যাঁ, ঢের ঢের ভাল!'

High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET